সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!

এই সর্বপ্রথম অবরোহ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের তথ্যের

আলোকে কোনে ধর্মের মতবাদের মধ্যে না গিয়েই

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের যৌক্তি এবং গাণিতিক প্রমাণ।



সাধারণ পাঠকের জন্য

বাংলায় সুখপাঠ্য বিশ্লেষণ

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

এস. এম. জাকির হুসাইন

তৃতীয় মুদ্রণ

মে ২০০৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ

সেপ্টেম্বর ২০০৪

প্রথম প্রকাশ

মার্চ ২০০০

প্রকাশক

শরীফ হাসান তরফদার

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন:৭১১৮৪৪৩

প্রচ্ছদ

এস.এম.মামুন

কম্পোজ

বাংলাবাজার কম্পিউটার

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা

ঢাকা ১১০০ ফোন: ৭১১১১৪৪

মুদ্রণে:

নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্

১৫ বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোনঃ ৯৬৬৭৯১৯

ISBN: 984-70277-0037-4

মূল্য: ৮০.০০

উৎসর্গ

আমার পিতা

মরহুম শেখ সফিউদ্দিনের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

তিনি আমাকে প্রথমে ধর্ম না শিখিয়ে ধার্মিক হতে শিখিয়েছিলেন।

কিন্তু পরে যখন আমাকে ধর্ম শেখাতে শুরু করলেন,

তখন তিনি চিরতরে চলে গেলেন।

আমি আজও পুরোপুরি ধার্মিক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি।

সূচিপত্র

লেখকের কৈফিয়ত

‘সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন’ বললে একটি প্রশ্ন এস মনে বেঁধেঃ তাহলে কি এত দিন তিনি ছিলেন না? মন্তব্যটি মূলত ‘সৃষ্টিকর্তা কি সত্যিই আছেন?’ প্রশ্নটির মতো সমান দোষের-যদি প্রশ্ন করা কোনো দোষের কিছু হয়ে থাকে। আসলে আমারা অধিকাংশ সময়ে মনে ক’রে বসি যে প্রশ্নের উৎস হলো সন্দেহ, কিন্তু সঠিক প্রশ্নের প্রধান উৎস হলো অনুসন্ধিৎসা। সব ব্যাপারে অবশ্য অনুসন্ধিৎসা কখনো কখনো ভালো দেখায় না- এবং কোনো কোনো অনুসন্ধিৎসাকে আমরা ‘নাক গলানো’ ধৃষ্টতা ব’লেও অভিহিত ক’রে থাকি। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা মানব মনের আদিমতম এবং চিরন্তন তাড়না। যিনি বিশ্বাসী তার মধ্যে কোনো সন্দেহ না থাকলেও অনুসন্ধিৎসা যে নেই এমনটি হলফ ক’রে বলা যাবে না। নিজের স্বরূপের সন্ধান করার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার- যদি, অবশ্য, সে কার্যক্রম হয় মার্জিত। এই বইতে লেখক সব সময়ে এই কথাটি মনে রেখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, অকাট্য জবাব পাওয়ার পর প্রশ্নে আর দোষের কি থাকতে পারে? প্রশ্ন করার মতো ধৃষ্টতা না দেখাতে পারলে জবাবটি দেয়া কি সম্ভব হতো? তবুও, মুক্ত মন নিয়ে বলব, প্রশ্ন ক’রে যদি কোনো অপরাধ ক’রে থাকি, তহালে তার সাজা পেয়েছি বিগত ছয়টি বছর ধ’রে-উত্তর খুঁজতে গিয়ে।

ভূমিকা

১. সৃষ্টিকর্তা বলেই যদি কিছু না থাকেন, তাহলে আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান কেউই থাকতে পারেন না।

২. কোরান দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করলে তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমি তো স্বয়ং কোরানকেই মানছি না। কোরানকে আমি তখনই মানতে পারব যখন সৃষ্টিকর্তাকে এবং তা থেকে আল্লাহকে-অস্তিত্বশীল ভাবতে পারব। আগে কোরান এবং পরে সৃষ্টিকর্তা-এ হলো বিশ্বাস; অপরপক্ষে, আগে সৃষ্টিকর্তা এবং পরে কোরান- এ হলো স্পষ্ট এবং বিজ্ঞানভিত্তিক *প্রমাণ*। প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু মানতে পারি না।

৩. পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মের মধ্য থেকে যারা সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সেই মেনে নেয়ার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন *বিশ্বাসকে*, যুক্তিকে নয়। বলা বাহুল্য, বিশ্বাস মানেই যুক্তি নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত উক্ত বিশ্বাস যুক্তির দ্বারা পুরোপুরি প্রমাণিত হচ্ছে। আজও পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেননি সৃষ্টিকর্তা আছেন। একইভাবে অবশ্য এ কথাও সত্য যে আজও পর্যন্ত কেউই প্রমাণ করতে পারেননি যে সৃষ্টিকর্তা নেই। মানুষের আজন্মের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সাফ করার জন্য এর যে-কোনো একটিকে প্রমাণ করাই যথেষ্ট। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমরা কেউ বলতে পারি না যে সৃষ্টিকর্তা আছেন।

৪. সঠিকভাবে প্রমাণ না করা পর্যন্ত আমরা যে-বিশ্বাস করি, তা আমাদের মানবিক অধিকার, কোনো মৌলিক অধিকার নয়। অন্য কথায়, বিশ্বাস করার অধিকার একটি *মানবিক* অধিকার, তা কোনো জ্ঞানপিপাসু নিরপেক্ষ ব্যক্তির মৌলিক অধিকার নয়। প্রশ্ন করার অধিকারই একটি মৌলিক অধিকার।

৫. অধিকন্তু, একথাও সত্য যে আজও পর্যন্ত কেউই প্রমাণ করতে পারেননি যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বা অনস্তিত্বকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আগে প্রমাণ করতে হবে এরূপ প্রমাণের অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না। যদি থাকে, তখন প্রমাণ করা যাবে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করতে হবে কি না।

৬. তবে এই জাতীয় কিছু যৌক্তিক প্রমাণ প্রচলিত আছে যা চূড়ান্ত না হলেও যার জবাব দেয়া খুব শক্ত:
সৃষ্টিকর্তাকে যদি থাকতেই হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁকে হতে হবে *সর্বশক্তিমান* এবং অনন্ত। কিন্তু যদি দেখানো যায় যে তাঁর কমপক্ষে একটি অক্ষমতা আছে, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। তাঁকে যদি অনন্তকাল ধ'রে অস্তিত্বশীল থাকতে হয়, তাহলে তাঁর একটি ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়: তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। এই না পারাটাই তাঁর একটি অক্ষমতা, যার কারণে তিনি সৃষ্টিকর্তা নন। আর যদি তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন, তহালে তিনি *নশ্বর* বা ধ্বংসশীল। আর নশর ব'লেই তিনি সৃষ্টিকর্তা নন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা ব'লে কিছু নেই।

এগুলি ছিল সৃষ্টিকর্তার অনস্তিত্ব সম্বন্ধে নাস্তিকদের মন্তব্য। অস্বীকার উপায় নেই যে অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা যথাযোগ্য প্রমাণ পেলে সঠিক ধর্মের ছায়াতলে এসে নিজেকেও আনন্দিত করতেন এবং ধর্মের ও মানবজাতির সেবা করতেন। অধিকিন্তু, তথাকথিত অনেক ধার্মিদের এবং ধর্মসম্প্রদায়ের মানবতাবিরোধী এবং ধর্মবিরোধী নগ্ন রূপ দেখে অনেক সচেতন জ্ঞানী ব্যক্তিই ঘৃণায় নাস্তিকতার পথ বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাস্তিকতারও কিছু ঘৃণ্য নগ্ন রূপ আছে। কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. ধার্মিকদের ওপর তারা যে-বিভক্তির দোষ আরোপ করেন, তা থেকে তারাও মুক্ত নন। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে নাস্তিকতারও বিভিন্ন রূপ আছে, এবং তাদের মধ্যে ঠিক সেই নাস্তিকতাকেন্দ্রিক বিরোধও লক্ষ্য করা যায়। মৌলবাদ ব'লে তারা যাকে বুঝান, সে দোষে তারাও দোষী।
২. বিশ্বাস যদি নিষ্ক্রিয় কোনো মনোভাব হয়ে থাকে, তাহলে অবিশ্বাসও তাই। প্রমাণ বিহীন বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস সমান দোষের, নিঃসন্দেহে। অবিশ্বাস করার অধিকার যদি তারা ভোগ করতে চান তাহলে সৃষ্টির্তার অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করার দায়িত্বও তাদের ওপর বর্তায়- যদি অবশ্য তারা সত্যিকার অর্থে 'প্রগতিশীল' এবং'জ্ঞানপিপাসু' হয়ে থাকেন। অন্যথায় অন্তত মুক্তচিন্তার ধার্মিকদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার অধিকার তাদের নেই।

আরেকটি বিষয় হলো, আজীবন জ্ঞান সাধনা ক'রে বা বিজ্ঞানচর্চা করার পর যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে নাস্তিক হতে 'বাধ্য' হন তাদের মুখে 'আমি নাস্তিক' কথাটা কিছু মানায় বটে, কারণ তিনি অনেক খুঁজেও তাঁকে পাননি। কিন্তু আমাদের দেশে এবং বিশেষত ভারতে কিছু জ্ঞানী নামধারী ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের প্রগতিশীল ব'লে পরিচয় দেন এবং মুক্তচিন্তার মানুষ ব'লে ভাবেন। তারা কেবল অতীতের কিছু ব্যর্থ মনীষীর এবং দার্শনিকদের উচ্চারিত অভিযোগগুলিকে আবারও তুলে ধরেন এবং নিজেদেরকে নাস্তিক ব'লে পরিচয় দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। ভাবখানা বর্তমানে এমন হয়ে উঠেছে যে এরূপ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিজেকে নাস্তিক ব'লে চিহ্নিত করাটা একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতে হলে, চিন্তাশীল কবি সাহিত্যিক লেখক 'চিন্তাবিদ' হ'লে, নিজেকে আস্তিক ব'লে চিহ্নিত করাটা যেন তাদের কাছে একটি বিরাট লজ্জাকর কাজ ব'লে মনে হয়। ধমের 'গাঁজাখুরি গল্প এবং পৌরাণিক কাহিনীগাথা' তাদেরকে রীতিমতো 'মন-গড়া বানোয়াট কাহিনীর পুরনো প্রত্নতাত্ত্বিক গন্ধ দেয়'। ধর্মের নামধারী কিছু কিছু পৌরাণিক গাথার কাল্পনিক ভিত্তি বিশ্লেষণ ক'রে তারা যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুষঙ্গ টেনে তাকে তারা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। অথচ তারা একবার ভেবেও দেনে না যে তথাকথিত 'মৌলবাদীদের' মতো তারাও হটকারী ত্বরিত-সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। *মৌলবাদীর* চিন্তা না ক'রে যা বলে, তারা চিন্তা ও গবেষণা ক'রে সেই একই কথা বলেছেন।

তারাও কোরান দিয়ে এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে অপ্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

মৌলবাদীদের এবং তথাকথিত প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মধ্যকার এই মিল এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আমাকে কৈশোর থেকে ভাবিয়ে আসছে। প্রতি পদক্ষেপে সবকিছু দেখেশুনে মর্মাহত হয়েছি। ভেতরে এবং বাইরে খুঁজে ফিরেছি প্রকৃত সত্যকে।

অবশেষে আমি বিশুদ্ধ যৌক্তিক এবং *গাণিতিক উপায়ে* প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যে *সৃষ্টিকর্তার* অস্তিত্ব আছে! প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকেও আমার এই আনন্দের অংশীদার করতে পেরে আর বেশি আনন্দিত হব।

আমার প্রমাণের ভিত্তি ছিল যুক্তি, গণিতের Field Theory এবং Set Theory, আইনিস্টাইনের Special and General Theories of Relativity, Big Bang Theory-এগুলি থেকে প্রাপ্ত পদ্ধতি এবং তথ্য এবং আমার নিজস্ব সমন্বয়। প্রমাণের সার্বিক কাঠামো ছিল Inductive- Assumption এর দোষ থেকে রেহাই পাবার জন্যই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। গবেষণা-নির্ভর সকল বিজ্ঞানের পদ্ধতিও Inductive । প্রমাণের প্রক্রিয়া ছিল গণিতের Field Extension এর প্রক্রিয়া। আমি আমার তত্ত্বের নাম দিয়েছি Field Theory of the Absolute।

আমি প্রমাণে যা দেখাতে পেরেছি:

- সৃষ্টিকর্তা আছেন।
- তিনি অসীম (মানবীয় অর্থে সময় ও স্থানের বিচারে)।
- তিনি সর্বশক্তিমান।
- সৃষ্টিজগতের ভাগ্য আগে থেকে নির্ধারণ করা তাঁর পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব। (যদিও সে ব্যাপারে আমি অধিক মন্তব্য করিনি।)
- তাঁর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব-কারণ কোনো আত্মবিরোধই (contradiction) তাঁর কাছে *আত্মবিরোধী* বা *অসম্ভব* নয়।
- আমরা কেবল তাঁর সন্ধান পেতে পারি তবে তাঁকে পেতে পারি না, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, তবে তাঁর রহস্য সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি না। আমি এটাও প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছি যে তা জানা সম্ভবও নয়।

আমি মনে করি প্রমাণটি চূড়ান্ত (যদিও অন্যান্য পদ্ধতিতে সত্যটিকে প্রমাণ করা যায় কি না তা জানার জন্যও আমি অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি)। তবে তাতে কোনো Assumption জনিত বা পদ্ধতিগত ক্রুটি রয়ে গেছে কি না তা এই মুহূর্তে আমার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। তা থাকলে পড়বে অন্য কারো চোখে। তবে, নিজের ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে প্রমাণটিকে পুরোপুরি সঠিক মনে হয়েছে।

অসিদ্ধান্তের দোলায় আর কেন ভাসবে চিন্তাশীল মানবজাতি? যদিও প্রমাণ পাওয়া এবং মেনে চলার মধ্যে রহস্যময় ব্যবধান রয়েছে, তবুও অন্তত যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য এই প্রমাণটি হবে একটি সত্যিকারের বিজয় এবং বিরল পাওয়া- যা হয়তো আমি নিজেও পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না।

তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে সচরাচর বিশ্বসীগণ মর্যাদা পান না। এই প্রমাণের পর সব সন্দেহ চিরকালের মতো ঘুচে যাবে। তখন অবিশ্বসীরাই তাদের মর্যাদা হারাবে, যদি বিশ্বাস করার যোগ্যতা তাদের না থাকে।

উলেখ্য, বাংলা অংশে প্রমাণের কঠিন যৌক্তিক বুনটকে ভেঙে কিছুটা তরল করা হয়েছে সাধারণ পাঠকের বুঝার সুবিধার জন্য। প্রকৃত Theory- টি উপস্থাপিত হয়েছে ইংরেজি অংশে। ইংরজি অংশে কিছু বিষয় আছে যা

বাংলা অংশে দেয়া হয়নি। অবশ্য তা বাদ দিয়েও সাধারণ পাঠক বাংলা অংশেই তার আসল জিনিসুকু পেয়ে যাবেন। আর যারা এ ব্যাপারে আরো চিন্তা করতে চান, তাঁদেরকে অনুরোধ করব ইংরেজি অংশটিকে ভালোভাবে বিবেচনা করতে।

বিনীত

এস.এম.জাকির হুসাইন

নভেম্বর ০১, ১৯৯৮

ঢাকা।

নাস্তিকের দুটি প্রশ্ন

চূড়ান্ত প্রমাণের কাজে লাগবে এমন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঠিক জবাব জেনে নেয়া যাক। প্রশ্ন দুটি শুধু নাস্তিকেরই নয়, বিশ্বাসী অথচ কৌতূহলী আস্তিকর নিজেকে আজীবন এই প্রশ্ন ক'রে থাকেন। কিন্তু প্রশ্নের ভাষাটা নাস্তিকের ভাষার আদলে তৈরী করা হয়েছে।

১. সৃষ্টিকর্তা যদি থেকেই থাকেন, তাহলে তিনি *অনন্ত* হতে পারেন না, কারণ তাঁকে যদি অনন্ত হতে হয়, তাহলে এমন হতে হবে যে তাঁর কোন শুরু ছিল না। কিন্তু যাঁর শুরু বা সৃষ্টি হয়নি, তাঁর কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। জন্ম ছাড়া অস্তিত্ব থাকা সম্ভাব নয়। কারণ ছাড়া কার্য হয় কিভাবে? (যদি বলা হয় যে তিনি আপনা থেকেই অনন্তকাল ধ'রে আছেন এবং থাকবেন, তাহলে তা হবে নিছক একটি বিশ্বাসের ব্যাপার। তাকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।)

   আবার যদি বলা হয় যে তাঁর কোনো সৃষ্টি ছিল, তাহলে তো তিনি আর সৃষ্টিকর্তাই থাকলেন না, অনন্ত হওয়া তো দূরের কথা। এ থেকে আমরা পাচ্ছি একটা আত্মবিরোধ (self-contradiction)। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই।
২. সৃষ্টিকর্তা যদি থাকবেনই, তাহলে তাঁকে আমরা অল্প সময়ের জন্য হলেও খুঁজে পাই না কেন? তাঁকে আমরা বুঝি না কেন? যে-মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই বুঝতে পারছে এবং খুঁজে পাচ্ছে, সে কেন সৃষ্টিকর্তা নামক কোনো সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে না? আসলে তিনি নেই ব'লেই পাওয়া যাচ্ছে না।

   জবাব

এই প্রশ্নেগুলোর প্রত্যেকটি খুব মৌলিক এবং জটিল। এর জবাব কেউ খুঁজে পাননি ব'লে ধার্মিকদের মধ্যে এই মনোভাবও চালু আছে যে সৃষ্টিকর্তার উৎস নিয়ে চিন্তা করা মহাপাপ, তা নিষিদ্ধ। তা করতে গেলে ধর্মচ্যুত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু না, এসব প্রশ্নের গাণিতিক জবাব আছে। আমরা ধাপে ধাপে এগুবো।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্রশ্ন একটা আত্মবিরোধের জন্ম দিচ্ছে। প্রশ্নগুলোর এই আত্মবিরোধী চরিত্রের বিষয়টিকে আমরা পরে বিবেচনা করব। আপাতত দেখো যাক *সৃষ্টিকর্তা* আছেন ধ'রে নিলে প্রশ্নগুলোর নৈর্ব্যক্তিক (objective) এবং যৌক্তিক জবাব কেমন হয়।

১. তাঁকে অবশ্যই অনন্ত বা *চিরস্থায়ী* হতে হবে, এবং
২. তাঁকে অবশ্যই দুর্বোধ্য হতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটাকে আগে প্রমাণ করা যাক। ধরা যাক অনেক খোঁজা-খুঁজির পর মানুষ, তাঁকে বুঝতে পারল। তাঁকে পুরোপুরি বুঝার পর, তাহলে, মানুষ আর তখন তাঁকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না, তিনি যতই ভয়ংকর বা ক্ষমতাশালী হোন না কেন। তখন মানুষ খুঁজবে এমন একজন সৃষ্টিকর্তাকে যাঁকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধ'রে চলতে থাকবে। মানুষ চিরকাল যাঁকে পুরোপুরি বুঝতে পারবে তাঁকেই অতিক্রম ক'রে যেতে চাইবে। সহজবোধ্যতে তার কোনো আগ্রহ নেই। একমাত্র তাই-ই মানুষের মাথা নত করতে পার যাকে সে পুরোপুরি বোঝে না। দূর্বোধ্যতা তাই মানুষের এত পছন্দ।

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা (যদি তিনি থেকে থাকেন) সহজবোধ্য হলেও মানুষ নিজের সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে দুর্বোধ্য ক'রে তুলত।

অর্থাৎ, প্রকৃত ধার্মিক সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে *না পেরেই* বেশি আনন্দিত। তিনি তাঁকে বুঝতে পারেন না ব'লেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হন যে তিনি আছেন। অবশ্য এই বুঝতে না-পারার পর্যায়ে উপনীত হতে হলে সৃষ্টিজগতের অনেক কিছুই বুঝতে হবে।

সুতরাং, অনন্ত মানুষের আকাঙ্খার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, সৃষ্টিকর্তাকে যদি থাকতেই হয়, তাহলে তাঁকে অবশ্যই দুর্বোধ্য হতে হবে। তা না হলে মানুষ তার নিজের তৃপ্তির জন্যই আসল সৃষ্টিকর্তাকে *সেচ্ছায়* উপেক্ষা করে গিয়ে এমন একজনকে কল্পনা করবে যাঁকে সে বোঝে না।

দুর্বোধ্যতার স্থলে 'পাওয়া' শব্দটাকে বসিয়ে একইভাবে বলা যায় যে মানুষ তাঁকেই সৃষ্টিকর্তা ব'লে স্বীকার করবে যাকে যে কখনও পাবে না ব'লে সে নিশ্চিত। সে যদি তাঁকে পেত, তাহলে তাঁর সহজলভ্যতার কারণে তাঁর ওপর থেকে তার কৌতূহল এবং আস্থা সব চ'লে যেত। সে খুঁজত এমন এক জনকে যাঁকে পাওয়ার জন্য সে জীবন দিতেও রাজি, অথচ সে জানে যে তাঁকে পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ, প্রকৃত জ্ঞানী ধার্মিক সৃষ্টিকর্তাকে পান না ব'লেই খুশি।

আপনি একটি পাত্রের- ধরা যাক ঘড়ার-মধ্যে হাতড়ে একটা এক টাকার মুদ্রা খুঁজছেন। পাচ্ছেন না। তার পরও পাচ্ছেন না। তার পরও না।

আপনি তা পেলেনই না।

অবশেষে আপনার সন্দেহ হলো মুদ্রাটা ঘড়াতে আদৌ আছে কি না। ওটাকে দিলেন উপুড় ক'রে।

নেই।

কারণ ওটাতে তা ছিল না।

ফলত আপনি নিজেকে বুঝাতে পারলেন,"মুদ্রাটাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এ কারণে যে তা ওখানে ছিল না।"

কিন্তু পরিস্থিতিটাকে একটু অন্যভাবে ভাবা যাক। আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে ঘড়াটাতে একটা এক টাকার মুদ্রা আছে। ঘড়াটাকে ঝাঁকা দিলে তার শব্দও হচ্ছে। অথচ আপনি যেই ঘড়াটার মধ্যে হাতড়াচ্ছেন, অমনি তা উধাও হয়ে যাচ্ছে। আপনি কোনো ক্রমেই তা আর পাচ্ছেন না। কী কী সম্ভাব্য কারণে এরূপ ঘটতে পারে? একটি কারণ এমন হতে পারে যে[১] আপনি মুদ্রাটাকে ধরার জন্য যেই ঘড়ার মধ্যে এক পাশে হাতড়াচ্ছেন, অমনি মুদ্রাটা ঠিক তার বিপরীত পাশে চ'লে যাচ্ছে। কিংবা হয়তো আপনি যেই তাকে ধরতে যাচ্ছেন অমনি তা আপনার কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে। আপনার হাত কোনো চুম্বকের কোনো একটি মেরু এবং মুদ্রাটাও অন্য একটা চুম্বকের একই মেরু হলে এমনই ঘটত (যদিও চুম্বকের একটিমাত্র মেরুকে কখনও আলাদাভাবে পাওয়া সম্ভব নয়)।

---

[1] ধ'রে নিতে হবে যে ঘটনাটিতে কোনো যাদুকরের ভেলকিবাজি নেই।

মানুষের কাজ এবং যোগ্যতা সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলে আপনি একটি বিশেষ মুহূর্তে কেবল ঘড়াটার একটামাত্র দিকেই হাতড়াবার যোগ্যতা রাখেন। ফলে আপনার হাত এবং মুদ্রাটা যদি উক্ত কায়দায় 'চুম্বকী' আচরণ করে, তাহলে আপনি সারা জীবন হাতড়েও মুদ্রাটাকে পাবেন না। অথচ আপনি নিশ্চিত যে তা ঘড়াটার মধ্যে আছে।

কিন্তু আপনার যোগ্যতার অসীম পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া যাক। ধরা যাক যে আপনি একই মুহূর্তে প্রকৃতির নিয়মকে উপেক্ষা ক'রে ঘড়াটার সব জায়গায় হাতড়াতে পারেন। এবং আরো যাক যে মুদ্রাটার চৌম্বকতের ধোঁকাবাজি এখন আর আপনার হাতের অসীম ক্ষমতার সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তু আপনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলেন যে এবারও মুদ্রাটাকে আপনি ঘড়াটার মধ্যে খুঁজে পেলেন না!

অথচ তা তাতে আছে।

আপনার হাত একই সাথে ঘড়াটার ভেতরের সব জায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে।তবুও ওটাকে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

গাণিতিকভাবে এবং তত্ত্বীয়ভাবে আপনি নিশ্চিত যে আপনার পুরো হাতটা ঘড়াটার যে-স্থানটুকু দখল ক'রে আছে, ঠিক তার মধ্যেই রয়েছে মুদ্রাটা। অথচ আপনি তা খুঁজে পাচ্ছেন না।

এর ব্যাখ্যা কী হতে পারে? কিভাবে এটা সম্ভব?

আসলে, আপনি যখন মুদ্রাটাকে খুঁজছিলেন, তখন ওটা আপনার হাতের মধ্যেই *ঢুকে প'ড়েছিল*।

আমরা যখন সৃষ্টিকর্তা অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে যাই, তখন সেই বিষয়বস্তুটি (অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব) আমাদের যুক্তির *পদ্ধতির* মধ্যে ঢুকে প'ড়ে উধাও হয়ে যায়। ফলে আমরা আর সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই না।

মানব যুক্তি তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদেরকে আমাদের যুক্তির শক্তিকে পরখ ক'রে নিতে হবে। কুয়োর মাপের লাফ দিয়ে কুয়োর ব্যাঙের পক্ষে কোনোদিনও কুয়ো থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়।[২]

অবশ্য ঘড়ার গল্পটি একটি উদাহরণ মাত্র, কোনো প্রমাণ নয়। আমরা সুস্পষ্ট প্রমাণের দিকে যাব।

---

[২] যুক্তির ভিত্তি এবং তাকে বিশ্লেষণ করার এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বইতে যত আলোচনা করা হবে তার প্রাথমিক বীজ রোপিত হয়েছে এই লেখকের অন্ধকারের বস্ত্রহরণঃ বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার রাজ্যে এক গোপন অভিযান বইটিতে (রোহেল পাবলিকেশনস)।

সৃষ্টিকর্তা নেই-এই ‘প্রমাণ’

নাস্তিক পন্ডিতগণ সৃষ্টিকর্তার অনস্তিত্বকে বিভিন্নভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অনেকে মনে করেন যে তাঁদের ‘প্রমাণ’ পর্যাপ্তভাবে চূড়ান্ত। এই প্রমাণগুলো দেয়া হয়েছে তিনটি বিষয় অবলম্বনেঃ

- ধর্মগ্রন্থের (যেমন বাইবেল, কোরান) বিবৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হয়েছে যে তাতে অসঙ্গতি আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মবিরোধী কথা বলা হয়েছে, যাদেও একটি সত্য হলে অপরটি অবশ্যই মিথ্যা হতে বাধ্য। কিন্তু এই বইতে আমরা উক্ত প্রমাণের বিশদ আলোচনার যাব না। যাওয়ার দরকারও হবে না। কোরান দিয়ে কোরানকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার কোনো মানে হয় না। কোনো নির্দিষ্ট যুক্তির সিস্টেমের স্বভাব এমনই (যা আমরা পরে দেখব) যে তার দ্বারা তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করা যুক্তিসঙ্গত হলেও তা দ্বারা তার অনস্তিত্বকে প্রমাণ করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত ব'লে বিবেচিত হয় না। কোরান বাইবেলকে বিচার করতে হবে তাদের বাইরে থেকে-পর্যবেক্ষণ দিয়ে, বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে যুক্তি দিয়ে। এই নিষেধাজ্ঞার প্রধান কারণ হলো এই যে, এমনও তো হতে পারে যে কোনো ‘আসমানী’ ধর্মগ্রন্থের দুটি বিবৃতি আমাদের কাছে আত্মবিরোধী মনে হচ্ছে আমরা তাদের প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে পারিনি ব'লে।

ভুলের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে না থাকতে পারলে যুক্তি মারাত্মকভাবে ধোঁকা দেয়(যা আমরা একটু পরেই দেখব)

- দ্বিতীয় ধরনের যে-প্রমাণগুচ্ছ হাজির করা হয় তা আসে পর্যবেক্ষণজাত বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে। সেখানেও প্রমাণের একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়- আত্মবিরোধ (self-contradiction)। ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু সুষম (symmetrical) এবং উদ্দেশ্যচালিত (purposeful)-ধ্রুপদী (classical) পদার্থবিদ্যার এই সিদ্ধান্ত (এবং অনেকাংশে ‘পূর্বধারণা’ বা assumption) যে আধুনিক বিজ্ঞানের যেমন Quantum Physics) প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, এবং ফলে সৃষ্টির পেছনে যে সত্যিকার অর্থে কোনো সুষম এবং মসৃণ পূর্বপরিকল্পনা নেই, তা দেখানোর মাধ্যমেই এরূপ প্রমাণ দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য শুধু পদার্থবিদ্যাই নয়, রসায়ণবিদ্যা, জীববিদ্যা, বিবর্তনবাদ ইত্যাদির আলোকে আরো অনেক খন্ড-প্রমাণ দেয়াও হয়ে থাকে। তবে এসব খন্ড-প্রমাণের উদ্দেশ্যই হলো ব্যাপকতর(overall) সিদ্ধান্তের সত্যতাকে বা যথার্থতাকে আরো মজবুত করা। এসব প্রসঙ্গ আমাদের এই বইতে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে।
- সৃষ্টিকর্তার অনস্তিত্বের সবচেয়ে ব্যাপক এবং মৌলিক যে-প্রমাণগুলো দেয়া হয়ে থাকে, তা দার্শনিক এবং যৌক্তিক। প্রমাণ হিসেবে এগুলোর যৌক্তিকতা, নির্ভরযোগ্যতা, এবং মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। এতে কোনো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তার মধ্যে অসঙ্গতি বা আত্মবিরোধ খোঁজা হয় না ব'লে প্রমাণের এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে নিরপেক্ষ বলা চলে। তবে *দৃষ্টিভঙ্গি* নিরপেক্ষ হলেও পদ্ধতি আগের মতোই-অর্থাৎ এক্ষেত্রেও প্রমাণের একমাত্র অবলম্বন হলো প্রতিষ্ঠিত যুক্তিতে একটি *আত্মবিরোধকে* তুলে ধরা।

ধরা যাক সৃষ্টিকর্তা আছেন। তাহলে, আগে যেমন দেখেছি, তাঁকে নিঃসন্দেহে হতে হবে *সর্বশক্তিমান* এবং *অনন্ত*। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাঁর কি কোনো *অক্ষমতাই নেই?* অন্তত একটি অক্ষমতা তাঁর আছে, এবং তা হলো এই যে তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। এটি নিঃসন্দেহে একটি অক্ষমতা। সুতরাং সর্বশক্তিমান ব'লে কিছু নেই, এবং ফলে, সৃষ্টিকর্তা ব'লেও কিছু নেই। অপরপক্ষে, যদি বলা হয় যে তিনি নিজেকেও ধ্বংস পারেন, তাহলে তো তিনি *ধ্বংসশীল* বা *নশ্বর* হয়ে গেলেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না। ফলে সৃষ্টিকর্তা ব'লে কিছু নেই।

এই ধাঁধাঁর মর্মার্থ বহন করে এমন আরো অনেক সমান্তরাল ধাঁধাঁ আছে, যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করলে যা থেকে একটাই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়- সৃষ্টিকর্তা ব'লে কিছু নেই, এবং থাকতে পারেও না। কয়েকটি বিশ্লেষিত হলো।

Big Bang Theory[3] অনুসারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা এক সময়ে ছোট একটা বিন্দুর বা কলমের খোঁচার (full stop-এর) মতো ছিল। ঐ বিন্দুটার ওজন ছিল গোটা সৃষ্টি-জগতের ওজনের সমান। প্রশ্ন হলো: ঐ বিন্দুটা ছিল কোথায়? অর্থাৎ বিন্দুটার চারপাশে কী ছিল?

শূন্যে? কিন্তু শূন্য এবং সময়ও এক ধরনের সৃষ্টি যা আগে ছিল না। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সাথে সাথেই শূন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আইনিস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদও তাই বলে।

তাহলে? কোথায় ছিল বিন্দুটি?

আসলে উক্ত পর্যায়ে আমাদের কল্পনা পৌঁছাতে পারে না। মানবীয় যুক্তি space (শূন্য) এবং time (সময়) এর বাইরে যেতে পারে না। এসব বিষয়কে বিবেচনা করার আগে মানবীয় যুক্তির দৌড় কতদূর তা জেনে নিতে হবে।

আরেকটা ধাঁধাঁ হলো একটা সাপকে নিয়ে। সাপটি ক্ষুধার্থ হলে নিজের লেজ গিলে খায়। ধরা যাক সে তার লেজ চিবিয়ে খায় না, গিলে খায়। তার উদ্দেশ্য সে নিজেকে পুরোপুরি গিলে খেয়ে ফেলবে। তা কি সে পারবে? একটু ক'রে চিন্তার মধ্যে এগুতে থাকুন এবং কল্পনায় দেখতে থাকুন সে কত দূর এগুতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নবাণ এসে প্রশ্নকর্তাকে বিদ্ধ করবে:

"নিজের লেজ সে গিলবে-বুঝলাম, কিন্তু রাখবে কোথায়?"

পেটে।

"পেটও তো সে খাবে। রাখবে কোথায়?"

গলায়।

"গলাও তো খাবে। রাখবে কোথায়?"

[3] যাকে চরমে নিয়ে গেছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Stephen Hawking।

গালের মধ্যে, অর্থাৎ মুখে।

"কিন্তু তার মুখটাও খাওয়ার কথা, যেহেতু সে নিজেকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু মুখকে সে খাবে কী দিয়ে?"

মুখ দিয়ে।

"সাপটার কয়টা মুখ?"

একটা।

"তাহলে এ আদৌ সম্ভব না।"

একদম না?

"না।"

যদি সৃষ্টিকর্তা তাকে আদেশ দেন, 'সাপ! তুই নিজেকে পুরোপুরি খেয়ে ফেল," তাহলেও না?

এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভব: যদি তিনি সর্বশক্তিমাণ সৃষ্টিকর্তা হন, তাহলে তিনি যেহেতু মানুষের চিন্তায় যা সম্ভব এবং অসম্ভব তার সবই সম্ভব করতে পারেন, সেহেতু তাঁর দেয়া কৌশল অনুসারে সাপটা তা *পারবে*।

কিভাবে?

তা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে তাঁর দ্বারা তা *সম্ভব।*

তা যে সম্ভব তা প্রমাণ করতে পারবেন?

কিভাবে তা সম্ভব তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তা জানতে পারলে তো আমরা তাঁকেই জেনে ফেলতাম, এবং তখন আর তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বলতাম না। অর্থাৎ তখন তিনি আর সৃষ্টি তখন তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকতেন না। সুতরাং যেহেতু আমরা জানি যে তা তাঁর দ্বারা সম্ভব, এবং যেহেতু আমরা জানি না কিভাবে তা সম্ভব, সেহেতু একথা প্রমাণিত হয় যে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা (যদি তিনি থাকেন) তা পুরোপুরি সম্ভব। তবে মানুষের পক্ষে তা দেখা সম্ভব নয়। মানুষ দ্যাখে চোখ দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে, মস্তিষ্ক দিয়ে। তার যুক্তিতে এরূপ ঘটনা দেখার মতো কোনো ক্ষমতা নেই ব'লে সে তা দেখতে পাবে না। সেখানে যুক্তিকে প্রয়োগ করতে চাইলে তা আত্মবিরোধের জন্ম দেবে। যুক্তির ক্ষমতা নেই নিজেকে অতিক্রম করার। ফলে যা তার আয়ত্তের বাইরে তা তার বিচারে অযৌক্তিক। কিন্তু আরো উন্নত কোনো যুক্তি থাকতে পার যার বিচারে এরূপ ঘটনা অযৌক্তিক নয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে এগুতে এগুতে হয়তো এমন যুক্তিও পাওয়া যাবে যার কাছে অযৌক্তিক ব'লেই কিছু নেই। সেখানে সবই যৌক্তিক। আর যৌক্তিক ব'লেই তা সেখানে সম্ভব। যুক্তির সে সিস্টেমে কোনো আত্মবিরোধ থাকতে পারে না।

"চমৎকার। কিন্তু আরো প্রমাণ চাই।"

অবশ্যই। পরে দেয়া হবে।

একই জাতীয় আরেকটা ধাঁধা আছে: এক মাথাবিশিষ্ট এক রাক্ষস রাগে নিজের মাথা ছিড়ে নিজে খাচ্ছে। কিভাবে?[4]

উত্তর একই ধরনের।

বেশ, তাহলে বুঝতে সুবিধা হলো যে উপরোক্ত আত্মবিরোধমুক্ত কোনো যুক্তি যদি থাকে, তাহলে তা অনুসারে সৃষ্টিকর্তা নিজেকে সৃষ্টিও করতে পারেন, ধ্বংসও করতে পারেন। তবে পার্থক্য এখানে যে নিজেকে ধ্বংস করার পরও তিনি সৃষ্টিকর্তাই থাকেন। এবং নিজেকে সৃষ্টি করার আগেও তিনি ছিলেন।

এানুষের বিচারে যাকে ধ্বংস বলা হয়, সৃষ্টিকর্তার বিচারে ধ্বংস মানে তা না-ও হতে পারে। এমনকি মানুষের বিচারেও তো পুরোপুরি ধ্বংস ব'লে কিছু নেই।শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুসারে, মানুষ সৃষ্টি-জগতের কোনো শক্তিকে অন্য প্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। আর আইনিস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$[5] সূত্র অনুসারে পদার্থই শক্তি, শক্তিই পদার্থ। সুতরাং সৃষ্টিজগতের কোনো পদার্থও ধ্বংস করা সম্ভব নয়। শুধু সম্ভব রূপান্তর।

এই যদি হয় মানুষের অবস্থা, তাহলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ব্যাপারটি আরো স্থির। এমনও তো হতে পারে যে তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে করতে সম্পূর্ণ নিজেতেই রূপান্তরিত হন, ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত হন না। অর্থাৎ তাঁর কোনো রূপান্তর নেই। তবে রূপান্তরের *প্রক্রিয়াটা*(process) তাঁর জানা আছে। নিজেকে ধ্বংস করতে করতে তিনি উক্ত *ধ্বংসের প্রক্রিয়ার*[৬] মধ্যে জীবিত থাকেন এবং উক্ত প্রক্রিয়ার পরও অক্ষত অবস্থায় থাকেন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে যুক্তির শক্তি পরখ করতে গিয়ে আমরা বারবার যুক্তির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। তার বাইরে যেতে পারছি না। আমরা আমাদের কথায় ঘন ঘন 'সম্ভবত' 'না-ও হতে পারে' 'হয়তো' এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার করছি। এমতাবস্তায় হয়তো আপনি বলবেন যে মানবীয় যুক্তি *স্বয়ংসম্পূর্ণ* ব'লে তার বাইরে আমাদের যাওয়ার দরকার হয় না, তার মধ্যে থেকেই আমাদের সব কাজ চ'লে যায়। কিন্তু এ কথার যথার্থতা কতখানি তা আমরা ততক্ষণ বুঝতে পারছি না যতক্ষণ আমরা যুক্তির সুতোটা কতটুকু লম্বা এবং তা দিয়ে কতদূর পৌঁছানো যায় তা দেখছি।

[4] নেয়া হয়েছে অন্ধকারের বস্ত্রহরণ বইটি থেকে। সেখানে এরূপ ধাঁধাঁর এবং সেট থিওরি বিষয়ক বার্ট্রান্ড রাসেলের ধাঁধাঁটিরও (পরে আলোচ্য) স্পষ্ট যৌক্তিক সমাধান দেয়া হয়েছে।

[5] যেখানে E= শক্তি, m = বস্তুর ভর, c= আলোর বেগ।

[6] প্রক্রিয়ার ধারণার ওপর ভিত্তি ক'রে *অন্ধকারের বস্ত্রহরণের নায়ক* একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিল যা দিয়ে সে রাসেলের ধাঁধাঁকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিল।

যুক্তির দৌড়

মোল্লার দৌড় মসিজিদ পর্যন্ত ব'লে মোল্লাকে গাল পাড়ার অভ্যাস আছে, অথচ আমরা কি কেউ কখনও ভেবে দেখেছি যে যে-যুক্তি দিয়ে আমরা মোল্লাকে কেবল মসিজিদ পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে থেমে যেতে দেখি তাও মোল্লার সাথে সাথে চ'লে তার সাথেই থেমে যায়? এখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখব যুক্তি কত দূর দৌড়ায়। এবং তা করতে গিয়ে আমরা কতগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অমীমাংসিত বিষয়ের চূড়ান্ত সত্যটি জানব। বিষয়গুলি হলো:

- মানুষের জ্ঞানের সীমা কোন পর্যন্ত? তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কী কী?
- স্বয়ংসম্পূর্ণতা (completeness) বলতে আসলে কী বুঝায়?
- যুক্তি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ (complete বা self-sufficient)?
- স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সীমার (limit) মধ্যে সম্পর্ক?
- আত্মবিরোধ (self-contradiciton) বলতে কী বোঝায়?
- যুক্তি কখন এবং কেন আত্মবিরোধের জন্ম দেয়?
- প্রমাণ (proof) কাকে বলে এবং তার পদ্ধতিগুলি কী কী?
- কোনো কিছু প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আত্মবিরোধের ধারণার ওপর কতখানি নির্ভর করা যায়?
- আত্মবিরোধ কাকে প্রমাণ করে?
- কোনো যৌক্তিক সিস্টেমে আত্মবিরোধের অস্তিত্ব আবশ্যিক কি না? এই প্রশ্নগুলোর বিশুদ্ধ (abstract) জবাব পাওয়া সম্ভব হলেই কেবল প্রমাণ করা যাবে সৃষ্টিকর্তা আছেন কি নেই।

মানুষের জ্ঞানের সীমা

বিষয়টিকে বিস্তারিত জানা অত্যন্ত কঠিন। কারণ প্রথমেই জ্ঞানকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। দেখতে জ্ঞানের উৎস কী কী।

কিন্তু খুটিনাটি আলোচনায় যাওয়ার কোনো দরকার আমাদের হবে না। আমরা সরাসরি জ্ঞানের গোড়ায় বা মৌলিক পর্যায়ে হাত দিবে। তবুও সাদামাঠাভাবে বলা যায়, জ্ঞানের উৎস হলো পঞ্চেন্দ্রিয়, যুক্তি, কল্পনা, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা। বুঝাই যাচ্ছে যে যুক্তি বাদে অন্যান্য উৎসগুলো থেকে অর্জিত জ্ঞান সীমিত এবং অবিশুদ্ধ এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা পুরোপুরি উদার ভাবে ধ'রে নিব যে মানুষের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো যুক্তি-বিশুদ্ধ গাণিতিক যুক্তি, যার মধ্যে কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নেই(subjectivity) । এভাবে বিচার করলে একথাও উদারভাবে স্বীকার করে নেয়া যায় যে, উক্ত যুক্তির দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সরাসরি বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু তবুও তার জ্ঞান সীমিত হতে বাধ্য।

উদাহরণ নেয়া যাক। আমরা *জানি* যে 'মানুষ মরণশীল'। কিন্তু এই জানা কি বিশুদ্ধ? মানুষ কি সত্যিই মরণশীল? কিভাবে আমরা তা জানলাম? এর কোনো ব্যতিক্রম এই পর্যন্ত হয়নি ঠিকই, কিন্তু কেউ কি এটা প্রমাণ

করতে পেরেছেন যে এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না? ধরা যাক কেউ প্রমাণ করেছেন যে এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না, কিন্তু তার দ্বারা কি এটা প্রমাণিত হয় যে এর কোনো ব্যতিক্রম হওয়া *সম্ভব* নয়?

ঐতিহ্যগতভাবে (traditionally) যুক্তিকে প্রধানত দুটি পযায়ে ফেলা হয়: *অবরোহ (*inductive) এবং আরোহ (deductive)।

অবরোহ যুক্তি হলো প্রকৃতিজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য থেকে ব্যাপকতর কোনো তথ্য (বা সিদ্ধান্ত) বের ক'রে নেয়ার পদ্ধতি। যেমন:

রহিম মানুষ।

করিম মানুষ।

তারা মরেছে।

এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে সবাই মরেছে।

সুতরাং মানুষ *মরণশীল*।

অবরোহ যুক্তি হলো *ব্যাপকতর* (general) কোনো সিদ্ধান্ত বা সত্য থেকে *বিশেষ (*specific) কোনো ব্যক্তি বস্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া। যেমন:

মানুষ মরণশীল।

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মানুষ জন্ম নেবে।

সুতরাং *ভবিষ্যতের মানুষও মরণশীল হবে।*

এখানে অবরোহ পদ্ধতির সিদ্ধান্তকে সত্য ধ'রে নিয়ে সর্বকালের গোটা মানবজাতির এক অংশ (অর্থাৎ ভবিষ্যতের মানুষ) সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই যুক্তি শুদ্ধ (valid)। প্রথম বাক্যটিতে যদি কোনো ভুল না থাকে তাহলে এর সিদ্ধান্তেও কোনো ভুল নেই।

কিন্তু প্রথম বাক্যটি (অর্থাৎ 'মানুষ মরণশীল') কি শুদ্ধ? এমন যদি হয় যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের বদৌলতে মানুষ চিরজীবী হতে পারবে, তাহলে? এরূপ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে একজন মুক্তচিন্তার মানুষ হয়ে কি স্বীকার ক'রে নেয়া যায় যে মানুষ মরণশীল? আদৌ নয়।

পাঠক হয়তো এই মুহূর্তে প্রশ্ন করছেন, "এ কথা সত্য যে মানুষ কখনও চিরজীবী হতে পারবে না। সুতরাং মানুষ মরণশীল কথাটি সত্য।"

আপনাকে কে বলল যে মানুষ কখনও চিরজীবী হতে পারবে না?

"যে-ই বলুক, পারবে না। যদি কখনও পারে, তখন আমার কথা আমি ফিরিয়ে নেব। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমার কথা সত্য।"

বেশ, তাহলে 'মানুষ মরণশীল' কথাটার বদলে বলছেন না কেন '*একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগ পর্যন্ত* মানুষ মরণশীল (যদিও আমি জানি সেই সময়টা কখন শুরু হবে)'?

সম্ভবত একন গুম হয়ে গেছেন।

আচ্ছা, ধ'রে নিলাম যে আসল সত্য হলো মানুষ মরণশীল- হয়তো অসীম কাল যাবত বেঁচে থেকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা কথাটার সত্যতা যাচাই করতে পারব। সুতরাং এরূপ অসম্ভব যাচাইয়ের ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে। স্বীকার ক'রে নিলাম যে মানুষ মরবেই, আজ হোক আর কাল।[7] কিন্তু *যুক্তিতে* তা আসছে না কেন? বৈধ (valid) যুক্তিটি হবে এরূপ:

রহিম এবং করিম ছিল মানুষ।

তারা মরেছে।

এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে সবাই মরেছে। কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

সুতরাং *এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মেছিল (এবং মরেছিল) তারা সবাই ছিল মরণশীল।*

এটাই হলো বৈধ সিদ্ধান্ত। এ থেকে আমরা বড় জোড় এটুকু অনুমান (infer) করতে পারি!

সুতরাং ভবিষ্যতেও যেসব মানুষ *পৃথিবীতে জন্মাবে তাদেরও মরণশীল হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।*

এর বাইরে গিয়ে যদি কোনো মন্তব্য করতে হয়, তাহলে তা হবে অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তাহলে দেখুন তো যুক্তির কি সীমাবদ্ধতা! 'মানুষ মরণশীল' কথাটা *প্রকৃত সত্য হয়ে থাকলেও যুক্তির মাধ্যমে তা পাওয়া যাচ্ছে না।* আর এই প্রক্রিয়ায় যে সাধারণীকৃত (generalized) জ্ঞান পাওয়া যায়, তাতে ভুল থাকলে আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে তা থেকে গৃহীত যে-কোনো সিদ্ধান্তই ভুল হতে বাধ্য।

সরাসরি আরোহ (deductive) জ্ঞান ব'লে কিছু নেই-অন্তত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা নেই। প্রতিদিন সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায় দেখে আমরা বড়জোড় বলতে পারি যে আগামীকালও একই ঘটনা ঘটার *সম্ভাবনা* আছে, কিন্তু নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না যে আগামীকাল তা *অবশ্যই ঘটবে।* তবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যুক্তির এত সূক্ষ্মতা সচরাচর বর্জন ক'রেই চলি।

[7] অসীমকাল যাবত বেঁচে থেকে যাচাই করতে হলে কিন্তু যাচাইকারীকে চিরকালই বেঁচে থাকতে হবে! ফলে 'মানুষ মরণশীল' কথাটাকে প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি তার উল্টোটাই প্রমাণ ক'রে বসবেন!

বিজ্ঞানসম্মতভাবে জ্ঞানার্জনের একটাই উপায় হলো অবরোহ (inductive) পদ্ধতি- যাতে প্রকৃতি থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া এই সাধারণীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে অবশ্য পরে আরোহ (deductive) পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বিশেষ কোনো বিষয়ে অনুমান করা যায়। যেমন:

১. মৌমাছি উড়লে গুণগুণ শব্দ হয়।
২. ওখানে গুণগুণ শব্দ হচ্ছে।
৩. সুতরাং ওখানে মৌমাছি উড়ছে।

মনে হতে পারে যে এখানে ১ নং বাক্য সত্য হলে ৩ নং বাক্যও সত্য, নইলে নয়। কিন্তু ১ নং বাক্য কি সত্য? ওখানে তো একটা ভোমরাও উড়তে পারে। ভোমরা উড়লে তো গুণগুণ শব্দ হয়। কিংবা একটা বড় মাছিও তো উড়তে পারে। সুতরাং ৩নং বাক্য শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ বাক্য হবে: সুতরাং ওখানে *হয়তো* মৌমাছি উড়ছে। ১নয় বাক্যটি যদি হতো 'কেবল মৌমাছি উড়লেই গুণগুণ শব্দ হয়', তাহলে ৩নং বাক্য অবশ্যই সত্য হতো। কিন্তু আপনাকে কে নিশ্চয়তা দেবে যে *কেবল* মৌমাছি উড়লেই গুণ গুণ শব্দ হয়? এ নিশ্চয়তা পেতে হলে আপনাকে পৃথিবীর সব পতঙ্গের ওড়ার মুহূর্তেও শব্দকে পর্যবেক্ষণ ক'রে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে কথাটি ঠিক কি না। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। আর তা সম্ভব হয় না ব'লেই অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে *অনেকগুলো* (সব নয়) পতঙ্গের ওড়ার শব্দকে পর্যবেক্ষণ ক'রে একটি ব্যাপক (generalized) সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান ততখানি *পুরোপুরি* বৈধ যতখানি সে পর্যবেক্ষণ থেকে অর্জন করছে। এবং সেই পর্যবেক্ষণের সত্যতার ওপর তার যুক্তির দৌড় নির্ভর করে। অথচ প্রকৃতির সত্যের অনেক কিছুই মানুব যুক্তির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ফলে:

হত্যা করা অপরাধ।

শিক্ষিত মানুষ ভদ্র হয়।

মানুষ সামাজিক জীব।

ইত্যাদি সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি সম্ভব নয়। আদালত যদি কাউকে হত্যার সাজা দেন, তাহলে (ঐ আদালতের দৃষ্টিতে আদালতের রায়কে মান্যকারী লোকেদের দৃষ্টিতে) তা কোনো অপরাধ ব'লে বিবেচিত হবে না; সব শিক্ষিত মানুষ ভদ্র না-ও হতে পারেন; কিছু কিছু মানুষ অসামাজিকও হতে পারে (যদি তারা রবিনসন ক্রুসোর মতো সংসারপ্রিয় না হয়)।

কিন্তু এই জ্ঞানগুলো শ্বাশ্বত এবং ব্যতিক্রমহীন:

(কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে) যা সত্য তা (ঐ ক্ষেত্রে) সত্যই।

যে মৃত সে জীবিত নয়।

২+২=৪

ইত্যাদি। লক্ষ করুণ, এখানে 'সত্য' দ্বারা 'সত্য' কে, 'জীবিত নয়' (=মৃত) দ্বারা 'মৃত'কে এবং ২+২ দ্বারা ৪ কে প্রমাণ করা হচ্ছে। কোনো তথ্যকে তার নিজের দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে। এরূপ জ্ঞান শুদ্ধ। তবে এরূপ জ্ঞান অর্জন করার জন্য মানুষকে প্রকৃতিজগতের দিকে তাকাতে হয় না, শুধু বাক্যের মধ্যে শব্দগুচ্ছের যৌক্তিক সম্পর্ক দেখলেই চলে। যুক্তি হলো একাধিক (পদের বা) ধারণার মধ্যের সম্পর্ক চিহ্নিত করার উপায়।

কিন্তু অবরোহ দিয়ে অবরোহকে প্রমাণ বা যাচাই করা যায় না। অবরোহ 'কিছু' থেকে 'সবগুলো' সম্বন্ধে অনুমাণ করে। ফলে জগতের সম্ভাব্য *সব অবরোহের* সত্যতা যাচাই করতে হলে আমাদেরকে তাদের 'কিছু' সংখ্যক থেকেই সবগুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যা হয়ে যাবে অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ *আমরা বলতে পারি:*

অবরোহ পদ্ধতি বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধান দেয় না।

সুতরাং, যেহেতু পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞানের একমাত্র উপায় হলো উপায় হলো অবরোহ পদ্ধতি, এবং যেহেতু অবরোহের বৈধতা সীমিত, সেহেতু মানব জ্ঞানের দৌড়ও সীমিত।

কিন্তু এ তো গেল মানব জ্ঞানের দৌড়, আমাদের সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা হলো মানুষের *যুক্তির দৌড়।*

তবে তার আগে দেখা যাক মানুষের জানার (অর্থাৎ জ্ঞানের) সীমাবদ্ধতা কেমন। অর্থাৎ আমরা জানব মূলত মানুষের জানার যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে কিছু তথ্য।

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাদেও সীমাবদ্ধতা আছে। তাদের একটির যে ক্ষমতা আছে অন্যটির তা নেই। যেমন আমরা বাতাসকে *অনুভব* করতে পারি, কিন্তু দেখতে পারি না। আমরা আলোকে *দেখতে* পারি, তবে *অনুভব* করতে পারি, কিন্তু দেখতে পারি না। আমরা আলোকে *দেখতে* পারি, তবে *অনুভব* করতে পারি না (যদি তার সাথে অনুভবযোগ্য তাপ না থাকে)। আমরা মিষ্টি কী তা *আস্বাদন* ক'রে বুঝতে পারি, কিন্তু *ছুঁয়ে* দেখে পারি না।

কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলির একটির সীমাবদ্ধতাকে অন্যটির ক্ষমতা দ্বারা কিছুটা পূরণ করা যায়।[৮] কিন্তু তার পরও সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা যায় না। কিছু জিনিস আছে যা শুধু যুক্তি দিয়েই বুঝা যায়-ধরা ছোঁয়া বা আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু এই যুক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে (যা আমরা একটু পরেই দেখব)।

Perpetual machine বা শ্বাশ্বত যন্ত্রের কথাই ধরা যাক। বহুকাল যাবত উদ্ভাবকগণ এমন একটি মেশিন উদ্বাবন করার চেষ্টা করেছেন যাকে একবার বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ ক'রে চালু ক'রে দিলে তা চিরকালই চলতে থাকবে- আর কোনো শক্তির প্রয়োজন হবে না। নিউটনের গতিবিষয়ক প্রথম সূত্র[৯] বলে যে তা নীতিগতভাবে সম্ভব। অথচ বাস্তবে এমন মেশিন *তৈরী* করা আদৌ সম্ভব নয়।

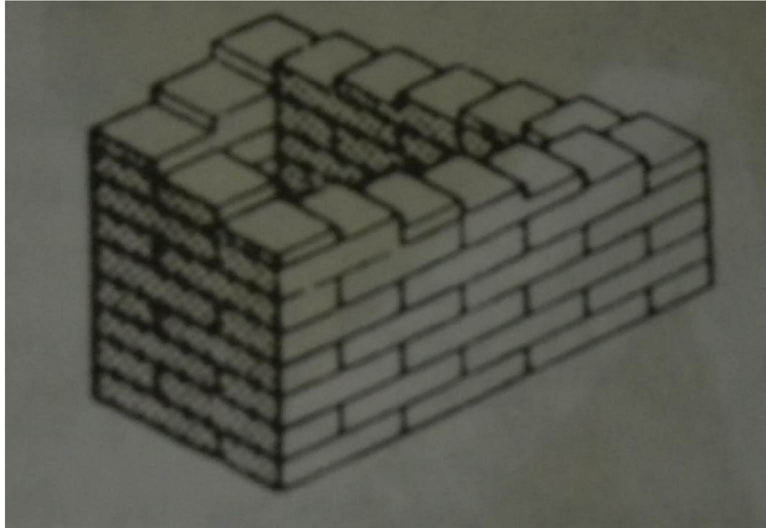
---

৮ দেখুন অন্ধকারের বস্ত্রহরণ।

৯ সূত্রটি হলো: বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল এবং (আপেক্ষিক অর্থে) স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকতে চাইবে। সূত্রটি মূলত গ্যালিলওর।

১৬১৮ সালে ইংরেজ ডাক্তার রবার্ট ফ্লাড (Robert Fludd, ১৫৭৪-১৬৩৭) এরূপ একটি মেশিন তৈরিও করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। তার পর অনেকেই চেষ্টা করেছেন কাজটি করতে, কিন্তু কেউই সফল হননি। এখন অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে এরূপ মেশিন সম্ভব নয়। কারণ মেশিনটি গতিশীল হলে যে ঘর্ষণ উৎপন্ন হয় তা-ই উক্ত গতিকে থামিয়ে দেয়। অর্থাৎ ঘর্ষণের কাজে কিছু শক্তি খরচ হতে থাকে। দেখুন তো, এমন মেশিনের কথা মানুষ ভাবে পারে অথচ সে তা তৈরি করতে পারে না। *এখানে ভাবতে পারাটাও যুক্তিসঙ্গত এবং বানাতে না পারাটাও যুক্তিসঙ্গত। তাহলে কী লাভ হলো যুক্তি দিয়ে? তা তো মানুষের যোগ্যতাকে ভাবনার স্তরে এনে দিতে পারল না।*

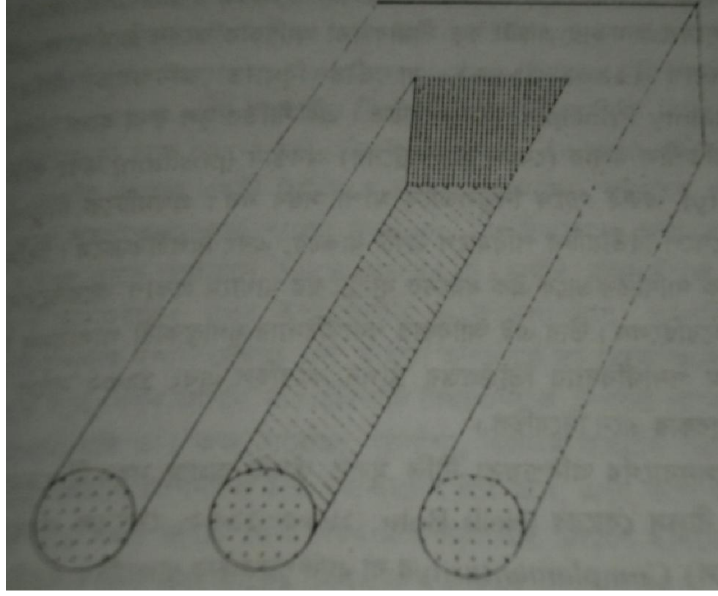
নিচের সিঁড়িগুলোর দিকে তাকান। এর যে-কোনো সিঁড়ি দিয়ে ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে যাত্রা শুরু করুন (মনে মনে)। মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেক বারই আপনি উপরের দিকে উঠছেন। অথচ আপনি আসলে আদৌ উপরে উঠছেন না। বরং কখনো কখনো নিচেই নামছেন। এটি কেবল ছবিতেই সম্ভব, বাস্তবে এরূপ সিঁড়ি বানানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক (two-dimensional, এখানে কাগজের মাত্রা দুটিঃ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) তলে যা সম্ভব, ত্রিমাত্রিক স্পেসে (three-dimensional space) তা সম্ভব না-ও হতে পারে।



চিত্র-১

একটি ছবির কথাই ধরুন যা কাগজের ওপর আঁকা হয়েছে বা যা কোনো ব্যক্তির বাস্তব ফটো। ছবিটিকে দেয়ালে আঠা দিয়ে সেঁটে দিন। এবার দূরে, কাছে, ডাইনে, বায়ে ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থানে স'রে গিয়ে ছবিটির দিকে তাকান। দেখবেন যে আপনি যে-কৌণিক দূরত্বেই স'রে যান না কেন, ছবিটি আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাকে যত দর্শকই দেখুক, প্রত্যেকে মনে করবে যে তা তার দিকে তাকিয়ে আছে। টিভির বা সিনেমার পর্দায়ও আমাদের দেখা এরূপ ধারাবাহিক (continuous) এবং বহুমুখী। কিন্তু ত্রিমাত্রিক স্পেসে কোনো মূর্তি বা কোনো বাস্তব মানুষ আপনার সাথে বা তার একাধিক দর্শকের সাথে এরূপ আচরণ করবে না। অন্য কথায়, দেখার উক্ত যোগ্যতা ত্রিমাত্রিক স্পেসে এসে অক্ষম হয়ে পড়ে। তা কেবল দ্বিমাত্রিক তলের ক্ষেত্রেই *সীমিত।*

এই চিত্রটি দেখুন। এখানে দুই মাত্রার সাথে তিন মাত্রা এক হয়ে *অযৌক্তিকভাবে* মিশে গেছে। ফলে এ কেবল অংকণেই সম্ভব, বাস্তবে এরূপ কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়। হাত দিয়ে ছবিটির প্রান্ত বন্ধ ক'ওে তাকে দেখার চেষ্টা করুন। এবার নিচের প্রান্ত থেকে শুরু কওে পুরা ছবিটিকে আরেকবার দেখুন।



চিত্র-২

উপরের উদাহরণগুলি থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট 'ত্রিমাত্রিক যুক্তিতে' যা আত্মবিরোধী ব্যাপার, 'দ্বিমাত্রিক যুক্তিতে' তা পুরোপুরি স্বাভাবিক এবং যৌক্তিকও হতে পারে। আপেক্ষিক space-time বিহীন যে শ্বাশ্বত বাস্তবতা, এবং ফলে যার মাত্রা কী তা আমরা কেউ জানি না, তাতে কি আত্মবিরোধ ব'লে কিছু আছে?

বিখ্যাত বৃটিশ পদার্থবিদ এবং গণিতবিদ Roger Penrose (যিনি Stephen Hawking এর বন্ধুও) স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে এমনও ক্ষেত্রে থাকতে পাওে যেখানে সবকিছু নির্ধারিত (deterministic) এবং যৌক্তিক, অতচ তার সংখ্যা গণনা ক'ওে শেষ করা যায় না।

মানুষের অযোগ্যতার কিছু কিছু সীমা কে তার যুক্তি অনেকাংশে অতিক্রম ক'ওে যেতে পারে। যেমন, ১,২,৩,৪,.. অসীম পর্যন্ত সংখ্যাগুলির একটির সাথে অপরটির যোগ, বিয়োগ, গুণন. ভাগ ক'ওে যত সংখ্যঅ পাওয়া যায় তা গুণে কেউ শেষ করতে না পারলেও প্রমাণ করা যায় যে তা *গণনাযোগ্য* (denumerable)।[১০]

মানুষের ক্ষমতার একটা বড় সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করেন জার্মান পদার্থবিদ হাইসেনবার্গ (১৯০১-১৯৭৬), যা তাঁর বিখ্যাত অনিশ্চয়তা নীতি বা Uncertainty Principle নামে পরিচিত। এই নীতির মূল কথা হলোঃ কোনো একটি গতিশীল কণার (যেমন ইলেকট্রনের) অবস্থান (positon) এবং গতিবেগ (velocity) *একই সাথে* নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। প্রথমটিকে নির্ভূলভাবে মাপতে গেলে দ্বিতীয়টির পরিমাপে ত্রুটি থাকবে এবং

[10] সহজ বিশ্লেষণের জন্য দেখুন *অন্ধকারের বস্ত্রহরণ।*

বিপরীতক্রমে। তিনি এই বিষয়টিকে গাণিতিক ভাবে এক ধরনের ম্যাট্রিক্সেও মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন এবং সূত্র বদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কার পদার্থবিদ্যার যুগান্তকারী পালাবদল ঘটিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যঅর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল এবং ১৯৩২ সালে তাঁকে নোবেল পুরষ্কার এনে দিয়েছিল।

হাইসেনবার্গেও অনিশ্চয়তা নীতি মূলত তাঁরই অগ্রজ সহকর্মী ডেনমার্কেও পদার্থবিদ নীলস্ বোরের (Neils Bohr, ১৮৮৬-১৯৬২, নোবেল পুরষ্কার পান ১৯২২ সালে) *Complementary* র বা *প্রতিপূরকতার* ধারণাটির একটি বিশেষ দিক। তাঁর এই ধারণার মূল কথা হলো: কোনো একটি সিস্টেমের একটি দিককে নির্ভুলভাবে জানতে গেলে তার অপর একটি সম্পৃক্ত দিককে নির্ভুলভাবে জানা যায় না। তিনি পদার্থবিদ-বিশেষত পরমাণুবিদ-হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই ধারণাকে শুধু পরমাণুর পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নিজেই বলেছেন যে সত্য (truth) এবং স্পষ্টতা (clarity) হলো complementary বা প্রতিপূরক; অর্থাৎ সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে গেলে তা আর পুরোপুরি সত্য থাকে না। আবরা তাকে পুরোপুরি সত্য রাখতে হলে তার বর্ণনা হয়ে যাবে কিছুটা ঝাপসা বা অস্পষ্ট।[১১] বার্ট্রান্ড রাসেলও (১৮৭২-১৯৭০) একই মন্তব্য করেছিলেন: স্পষ্টতা সর্বদাই শুদ্ধতার শত্রু।[১২] যে-কোনো চিন্তাবিদই তাঁর মনের কথাটিকে ভাষায় প্রকাশ করার সময়ে এ কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পান।

দৈনন্দিন জীবন থেকে এরূপ অনেক ঘটনাযুগলকে দেখানো যায়। এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য উদাহরণ হলো perspective বা পরিপ্রেক্ষিত। ছবি আঁকতে গিয়েই মানুষ এই ধারণাটিকে বেশি ব্যবহার করেছে- এবং বহু আগে থেকেই এটি মানুষের জানা ছিল। পরিপ্রেক্ষিতের সর্বপ্রথম সার্থক বিস্তারিত জ্যামিতিক আলোচনাও করেছিলেন একজন চিত্রকর-লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। এই ধারণাটির বিশ্লেষণ পুরোপুরি জ্যামিতি-নির্ভর। এর সাথে পরিচিত না হলে কোনো ছবি আঁকাই সম্ভব নয়। এর সহজ বর্ণনা হলো এরূপ: আপনি কোনো একটি জিনিসকে (যেমন ভবনকে) স্পষ্টভাবে দেখতে চাইলে তার সমগ্রকে দেখতে পাবেন না, এবং, বিপরীতক্রমে, তার সমগ্রকে দেখতে চাইলে তাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারবেন না। অর্থাৎ, কথাগুলিকে একটি অট্টালিকার উদাহরণের ওপর উপরিপাতন ক'ওে বলা যায়, আপনি যদি অট্টালিকাটির পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যটি দেখতে চান, তাহলে আপনাকে তা থেকে অনেক দূওে স'রেযেতে হবে, যখন আপনি তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে দেখতে পাবেন না। আবার আপনি যদি তার কক্ষ, দরোজা, জানালা, চিত্রকর্ম ইত্যাদি জিনিসগুলি দেখতে চান, তাহলে আপনাকে তার খুব কাছে যেতে হবে, এবং ফলে আপনার পক্ষে আর সমগ্র ছবিটি দেখা সম্ভব হবে না। এই কারণে ছবিতে দূরের কোনো জিনিসকে ছোট এবং কাছের জিনিসকে বড় ক'রে দেখানো হয়।

এক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিষয় হলো, *অট্টালিকাটি যত বড় হবে, তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে আপনাকে যেতে হবে তত দূরে।* অংশকে দেখতে হলে সব অট্টালিকার ক্ষেত্রে সমান নৈকট্যই যথেষ্ট, অথচ পূর্ণাঙ্গকে দেখাই যত সমস্যা।

[11] দেখুন Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (Vintage, 1993) P.58.
[12] Mysticim and Logic (Routledge, 1994) P.78

মানুষের মাপার (এবং জানার, কারণ বিজ্ঞানে জানার *একমাত্র* উপায় হলো মাপা) এই সীমাবদ্ধতা থেকেই বুঝা যায় যে তা আসলে শুধু সীমাবদ্ধ নয়, স্থিরও বটে। এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে *এই সৃষ্টিজগৎকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে গেলে তা থেকে কত দূওে যেতে হবে?* কিন্তু আমরা কি সৃষ্টিজগৎ থেকে আদৌ বাইওে যেতে পারি? ঈারি না ব'লেই আমাদেও পক্ষে এর উৎসের রহস্য অন্তত বিজ্ঞানের দ্বারা কোনো দিনও জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো কিছুর মধ্যে থেকে তার সমগ্রকে দেখা আদৌ সম্ভব নয়, অংশের মধ্যে সমগ্র থাকলেও। অংশের মধ্যে সমগ্র থাকলেও ঐ সমগ্রের উৎস উক্ত অংশের মধ্যে নেই।[১৩] ফলে সৃষ্টিরহস্যেও চূড়ান্ত ব্যাখ্যা আসা সম্ভব যুক্তি থেকে, বিজ্ঞান থেকে নয়।

কিন্তু তার জন্য আগে জানতে হবে যুক্তি কেন কাজ করে, কখন করে, এবং কখন করে না। এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যুক্তি এজন্য কাজ কওে যে তা *স্বয়ংসম্পূর্ণ।* কিন্তু *স্বয়ংসম্পূর্ণতা* আসলে কী? ঐা স্বয়ংসম্পূর্ণ তা কি মানবীয় দৃষ্টিতে *অসীম* হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পেলে এই বইতে যা প্রমাণ করতে চাওয়অ হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে।

আরেকটি সহজ অথচ চমৎকার বিষয় নিয়ে এখন ভাবা যায়: আমরা সেই জিনিসটিকে কিভাবে ছবিতে আঁকি যা এত দূওে আছে যে আমরা তাকে দেখতেই পাই না? তাকে আমরা একদম আঁকিই না। অথচ তার পর আমরা ছবিটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবি।

ডবশ্বজগৎকে আমরা কেউ দেখি না, দেখি আমাদেও মন ও যুক্তির মধ্যে তার অংকিত ছবি। সেই ছবিতে যা নেই তাকে আমরা আর স্বীকার করতে চাই না। এটা হলো মানুষের সামগ্রিক সীমাবদ্ধতা।

[13] পরবর্তীতে প্রদত্ত ইংরেজি অংশ দেখুন।

যুক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতা

যুক্তির দৌড় কত দূও তা জানতে হলে আগে জানতে হবে তা কোন মাঠে দৌড়ায়। তবে পাঠকের ভয় পাবার কিছু নেই, যুক্তি যদিও বিশুদ্ধ বিমূর্ত একটি বিষয়, তবুও আমাদেও আলোচনা বুঝতে আপনারা কোনো সমস্যা হবে না। কারণ আমরা যুক্তির দেহ-ব্যবচ্ছেদ করব না-যা আসলে একটি জটিল দার্শীনক বিষয়, আমরা শুধু তার দেহটিকে বাইওে (এবং ভেতর) থেকে ছুঁয়ে দেখব। প্রথমে আমরা একটি প্রস্তাবনাকে প্রমাণ করব

যুক্তি যে-মাঠে দৌড়ায়, তার সবখানেই সে দৌড়ায়। এই অর্থে যুক্তি হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রথমেই জানা দরকার মাঠ বলতে এখানে কী বুঝানো হচ্ছে। আসলে এখানে মাঠ দ্বারা এক ধরনের বিমূর্ত, সম্পূর্ণ ধারণা-নির্ভও গাণিতিক space বা অঞ্চলকে বুঝানো হচ্ছে। এর সাথে বাস্তব শূণ্যতার বা স্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে তা স্থান-কাল নির্ভও নয়।[14] তবে মনশ্চক্ষে দেখার সুবিধার জন্য তাকে একটি তলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থবিশিষ্ট দ্বিমাত্রিক space এর) সাথে তুলনা করা যায়।[15] এই মাঠকে এখন আমরা চিহ্নিত করব এবং মাপব। তবে অত্যন্ত সহজ কায়দায় কিছু সংখ্যা নিয়ে খেলা করতে করতে আমরা তা করব।

কল্পনায় ধ'ওে নিন যে আপনি এখন থেকে আনুমানিক ছয় হাজার বছর আগে সুমেরীয় সভতার যুগে জন্মেছিলন। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সৃজনশীল, এবং অধ্যবসয়ী। তখন মানুষের গণনা করার সুবিধার জন্য আপনি তাদেরকে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এই দশটি সংখ্যা উপহার দিয়েছেন।[১৬] হাতের দশটি আঙুল থেকেই গণনার এই ধারণাটি আপনি পেয়েছিলেন। আপনার এই উদ্ভাবনে সুমেরের অধিবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তারা শিকারের কাজে, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেনে আপনার সংখ্যাগুলোকে ব্যবহার করতে লাগল (ধরা যাক তারা ঠিক এই প্রতীকগুলিই ব্যবহার করত।)

কিন্তু সমস্যা একটি হলো: ১০ এর বেশি সংখ্যক কোনো জিনিস তারা গুণতে পারল না। এমনকি (ধরা যাক) ২০ টি জিনিসকে গোনার ক্ষেত্রে যে ১০ কে ২ বার ব্যবহার করতে হবে তারা তাও বুঝল না- যেহেতু তার বেশি সংখ্যা তাদেও জানা নেই, এবং ফলে তাদেও অভিজ্ঞতায় তা নেই। তারা এসে আপনার কাছে এ ব্যাপাওে অভিযোগ করল।

আপনি ভেবে দেখলেন, তাইতো, ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ তাদেও মধ্যকার দুটি সংখ্যাকে যোগ করলে এমন নোতুন কোনো একটি সংখ্যা পাওয়ার কথা যা ১ থেকে ১০ এর মধ্যে নেই। যেমন, ৯ + ৩ = ..? এর জন্য আপনি নোতুন কোনো সংখ্যঅ উদ্বাবন করেননি। কিন্তু প্রয়োজন আপনার উদ্ভাবনের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিচ্ছে না। ফলে আপনি প্রথমে ১ দশ, ২ দশ, ৩ দশ ইত্যাদি কায়দায় ধরা যাক ১,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার নীতিগত সমাধান হলো না-যদিও এখন আগের চেয়ে বেশি জিনিস গোনা সম্ভব হলো। এবারও দেখা গেল যে ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যকার দুটি বা ততোধিক

---

14 আপাতত।

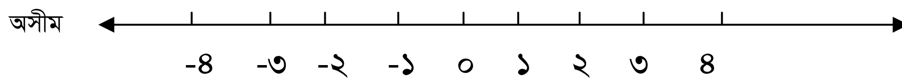
15 তাকে ত্রিমাত্রিক শূন্যের সাথেও তুলনা করা যেত, তবে জটিলতা এড়াবার জন্য দ্বিমাত্রিক তলই আমরা বেছে নিব। তাছাড়া গাণিতিক যুক্তি দ্বারা যে-কোনো বিষয়কে যে-কোনো মাত্রার তলে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

16 এই আলোচনায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা কিছুটা রক্ষা করা হয়েছে, প্রকৃত ইতিহাস নয়। কারণ তা আমাদেও প্রয়োজন নেই।

সংখ্যাকে যোগ ক'রে এমন সংখ্যার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে যা প্রকাশ করার জন্য কোনো সংখ্যা ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে নেই, অর্থাৎ আপনার সংখ্যার সেটটি *স্বয়ংসম্পূর্ণ* (complete) নয়। অর্থাৎ তা *যে-সমস্যার জন্ম দেয়ার যোগ্যতা রাখে তার সমাধান দেবার যোগ্যতা রাখে না।* ফলে আপনি বুঝে ফেললেন যে ১, ২, ৩, ৪,.......এই ধারার কোনো শেষ সংখ্যা ব'লে কিছু থাকা উচিত নয় এবং তা নেই। অর্থাৎ ধারাটি অসীম। এমনকি আপনি ১ থেকে ১ কোটি পর্যন্ত সংখ্যা উদ্ভাবন করলেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো না কারণ, উদাহরণসরূপ, ১,০০,০০,০০০+১ কে লিখতে হলে যে সংখ্যার দরকার তা উক্ত ১ থেকে ১ কোটির মধ্যে নেই। ফলে আপনি আপনার দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে স্বাভাবিক সংখ্যার কোনো শেষ সীমা থাকতে পাওে না-থাকলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না।

কিন্তু আপনার কাছে আরো অভিযোগ আসতে লাগল: ১ থেকে ১ কোটির মধ্যকার যে-কোনো দুটি সংখ্যার একটি থেকে অপরটি বিয়োগ করলে বিয়োগফল উক্ত *সংখ্যাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ* থাকে বটে, তবে ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যাকে বিয়োগ করলে যে-সংখ্যা পাওয়ার কথা তা ১ থেকে অসীম পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যেও নেই।[১৭] ফলে আপনি নোতুন ক'রে আরো সংখ্যা উদ্ভাবনে রত হলেন। আপনি দেখলেন যে, উদাহরণস্বরূপ, ২টি গরু থেকে ২টি গরু বাদ দিলে একটি গরুও থাকে না। এই 'কিছু -না' কে আপনি বললেন ০,[১৮] এবং নিয়ম বেঁধে দিলেন যে কোনো সংখ্যার সাথে এটিকে যোগ করলে বা কোনো সংখ্যা থেকে এটিকে বিয়োগ করলে ফল পাওয়া যাবে উক্ত সংখ্যাই। এবার আপনি এক হাজার বছর বেঁচে রইলেন এবং গ্রীক সভ্যতার যুগে এসে পাটীগণিতকে অতিক্রম ক'রে বীজগণিত উদ্ভাবন করলেন। সেখানে আপনি ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যাকে কিভাবে বিয়োগ করতে হয় তার জন্য একটি নিয়ম দাঁড় করালেন। আপনি ঘোষণা করলেন যে সেসব ক্ষেত্রে বিয়োগের *হিসাবটা* থাকবে সাধারণ বিয়োগের মতো, অথচ বিয়োগফলের আগে একটি বিয়োগ চিহ্ন বসিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সেক্ষেত্রে একটি ছোট সংখ্যা থেকে একটি বড় সংখ্যাকে বিয়োগ করা হয়েছে। এবং আপনি আরো দেখলেন যে, -১, -২, -৩, -৪,.......এরূপ বিয়োগবোধক সংখ্যাও থাকতে হবে অসীম সংখ্যক, নইলে ....-৪, -৩, -২, -১, ০, ১, ২, ৩, ৪,.....-এই সেটটি *স্বয়ংসম্পূর্ণ* হবে না।

আপনি জিনো, পীথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ দার্শনিককে গণিত শিখিয়েছেন। তাদেরকে শেখাতে গিয়ে নিজেই শিখেছেন আরো বেশি। উদ্ভাবন করেছেন *সংখ্যারেখাকে*, যাতে বিভিন্ন বিন্দুর দ্বারা আপনার উদ্ভাবিত সংখ্যার *স্বয়ংসম্পূর্ণ সেটটিকে* দেখানো যায়:



---

[17] অরা যাক কোনো প্রয়োজনে ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখাকে বিয়োগ করার দরকার হয়েছিল। অন্য ধরনের বর্ণনা এবং বিশ্লেষণের জন্য এই লেখকের The Beauty of Mathematics বইটি দেখুন।

[18] যদিও শূন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল অনেক পরে।

আপনি একাধিক সংখ্যার সমন্বয় ঘটাবার জন্য শুধু জেনেছেন 'যোগ' (+) এবং 'বিয়োগ' (-) এই দুটি *স্বমন্বয়* বা operation এর ধারণা। ফলে আপনার উদ্ভাবিত পূর্ণসংখ্যার (whole number) অসীম সেটটি *স্বয়ংসম্পূর্ণ* (complete বা closed)-অর্থাৎ উক্ত দুটি সমন্বয়-ক্রিয়া ব্যবহার ক'রে আপনি যতগুলি সংখ্যা নিয়েই হিসাব করেন না কেন, সমন্বয়ের ফল উক্ত সংখ্যারেখার মধ্যেই থাকবে। ফলে আপনি সবাইকে অভয় দিলেন: যেহেতু আমার সংখ্যা-ব্যবস্থাটি (number system) স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেহেতু উক্ত সংখ্যাগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত যে-কোনো সমীকরণই সমাধান সম্ভব।[১৯]

কিন্তু যুদ্ধজয়ের জমি ভাগাভাগিতে আলেকজান্ডার সহ অন্যান্য রক্তপিপসু রাষ্ট্রনায়কদের সাহায্য করতে গিয়ে আপনি দেখলেন যে, ৫ ÷ ২= ২, ৬ ÷ ২ = ৩, ১২ ÷ ৬ = ২ ইত্যাদি ভাগফল আপনার সংখ্যারেখার মধ্যকার কোনো-না-কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ কও়ে, কিন্তু ৩ ÷ ২ = ? ৪ ÷ ৩ = ? ৭ ÷ ৪ = ? ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাগফল যা হওয়া উচিত তা প্রকাশ করার জন্য কোনো সংখ্যা তাতে নেই। *জমি ভাগ* করতে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছিল না- যেহেতু গ্রীকরা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে জ্যামিতি শিখিয়েছিল-কিন্তু ভাগফলকে *অংকের মাধ্যমে প্রকাশ* করতেই হচ্ছিল যত ঝামেলা। ফলত আপনি প্রথম প্রথম সমন্বয়গুলিকে শুধু চিহ্ন দিয়েই লিখে রাখলেন ৩ ÷ ২ = $\frac{৩}{২}$, ৫ ÷ ৪ = $\frac{৫}{৪}$ ইত্যাদি। কিন্তু আপনার বেশি দেরি হলো না, আপনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উক্ত ভাগফলগুলিকে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ অংকগুলি এবং একটি চিহ্নের (যার নাম আপনি রেখেছেন দশমিক বিন্দু)[২০] সাহায্যে লিখতে পারলেন। এতে আপনি বিস্মিত হলেন: আপনি ভেবেছিলেন যে সংখ্যারেখার ১, ২, ৩, ...ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যার বাইরে অন্য কোনো সংখ্যা ছিল না, কিন্তু এখন দেখলেন যে রেখাটির প্রতিটি অদৃশ্য বিন্দুতে প্রদর্শনের জন্যই সংখ্যা রয়েছে, যারা পূর্ণসংখ্যা নয়। এখন আপনি, উদাহরণস্বরূপ, ২x = ১ জাতীয় সমীকরণের সমাধান পাচ্ছেন। কারণ x = $\frac{১}{২}$ এর $\frac{১}{২}$ = কত? তা আপনি জানেন। এভাবে আপনি b যে-কোনো সংখ্যা হলে $\frac{১}{b}$ = কত হবে তা বের করতে পারছেন। $\frac{১}{b}$ আকারের সংখ্যাটিকে আপনি নাম দিলেন b এর inverse (multiplicative inverse বা গুণাত্মক বিপরীত)। এতদিন $ax + b = 0$ আকারের সব সমীকরণকে আপনি সমাধান করতে পারতেন না, কারণ আপনার পূর্ণসংখ্যার সেটটি ভাগ-প্রক্রিয়ার সাপেক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না (was not closed with respect to division)। কিন্তু:

$$ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

$$= -b \times \frac{১}{a}$$

---

19 কোনো সমীকরণের সমাধানযোগ্যতার *প্রাথমিক* শর্ত এটাই।

20 প্রক্রিয়াটি এখানো দেখানে হলো না। এর মৌলিক ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন এই লেখকের *The Beauty of Mathematics.*

ব'লে, এবং -b (বিয়োগবোধক পূর্ণসংখ্যা, যা আপনার সংখ্যারেখায় ছিল) এবং $\frac{1}{a}$ (a এর inverse) এর মানের জন্য দরকারী সংখ্যা আপনার সংখ্যারেখায় আছে ব'লে, আপনি উক্ত আকারের যাবতীয় সমীকরণের সমাধান দিতে পারছেন। আপনি মনে করলেন যে পৃথিবীতে যত ধরনের সংখ্যা থাকা সম্ভব তার সবই এখন আপনি পেয়ে গেছেন এবং আপনার সংখ্যা রেখার *সরলরৈখিক মাঠে* '+', '-', '÷', '×' এই যুক্তির ঘোড়াগুলো *প্রতিটি বিন্দুতে পা রেখে দৌড়ায়।*

কিন্তু জ্যামিতির একটি বিশেষ ক্ষেত্র থেকে আহরণ ক'রে পীথাগোরসের এক অনুসারী আপনাকে একটি সমীকরণ দিলেন:

$$ax^2 - b = 0$$

$$ax^2 = b$$

$$x^2 = \frac{b}{a}$$

যার সমাধান দিতে গিয়ে আপনি দেখলেন যে আপনার উক্ত তথাকথিত সংখ্যার অসীম সেটটি (যাকে আপনি নাম দিয়েছেন the set of rational numbers) যথেষ্ট নয়। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন:

$b =$ ৮, $a =$ ২ হলে

$\frac{b}{a} = \frac{৮}{২} =$ ৪

কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণন করলে গুণফল হয় ৪?

উত্তর: ২ (কারণ, ২ × ২ = ৪)।

সুতরাং-

২$x^{২}$ - ৮ = ০ হলে

২$x^{২}$ = ৮

$x^{২} = \frac{৮}{২}$

$x^{২}$ = ৪

$x = \sqrt{৪}$

$x \times x$ = ২ × ২

$x =$ ২।

যে সংখ্যাটিকে সমান দুটি সংখ্যার গুণফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে তাকে আপনি '$\sqrt{}$' চিহ্নের মধ্যে রাখলেন। ফলে আপনি দেখলেন যে $\sqrt{৯}$, $\sqrt{১৬}$, $\sqrt{৩৯}$ ইত্যাদিও জন্য পূর্ণ সংখ্যায় মান পাওয়া যায়, যা আপনার সংখ্যারেখায় আগে থেকেই আছে। তাই এসব সমীকরণের সমাধান দিতে আপনার কোনো বেগ পেতে হলো না।

কিন্তু আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকলেন: কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণন করলে গুণফল হবে ৪?

উত্তরও পেলেন, ২।

এবার প্রশ্ন করলেন, কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণন করলে গুণফল হবে ২?

উত্তর: ......?

আপনি ঝামেলায় প'ড়ে গেলেন। ১ × ১ = ১। ১.৫ × ১.৫ = ২.২৫, ...। কোনো সমাধান পেলেন না। তার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেল। আপনি ব'সে হিসেব করেই যাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন প্রমাণ করতে পালেন[২১] যে, সংখ্যাটি যাই হোক না কেন, তাকে $\frac{b}{a}$ আকারে অর্থাৎ দু'টি পূর্ণসংখ্যার কিংবা দশমিক সংখ্যার ভাগফল হিসেবে, প্রকাশ করা যায় না। এ হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতের সংখ্যা। এবং রাবারের তৈরি আপনার সেই সংখ্যারেখাটিকে জোরে টেনে লম্বা করতেই আপনি দেখতে পেলেন যে তাতে অসংখ্য বিন্দু খালি প'ড়ে ছিল, যেগুলিতে আসলে $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$, $\sqrt{৭}$ ইত্যাদির মানগুলি বসাতে হবে। কোনো দুটি rational number এর ভাগফলের মাধ্যমে (অর্থাৎ সেই $\frac{b}{a}$ এর মাধ্যমে) এদেরকে প্রকাশ করা যায় না ব'লে আপনি এদের নাম দিলেন irraitional number, এবং আপনি তাদের মান বের করারও একটি সুন্দর পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন।[২২]

আপনার এখন সাহস জ্ঞান এবং বয়স সবই বেড়ে গেছে। আপনি। আধুনিক যুগের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছেন। এখন আপনার সংখ্যারেখাটি *অসংখ্য* সংখ্যায় ভরাট এবং *স্বয়ংসম্পূর্ণ।* তা এখন শক্তিশালী কায়দায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে যে-কোনো সমীকরণের সমাধানই এখন তা থেকে পাওয়া যায়। আপনি যাবতীয় সংখ্যার নাম রাখলেন real number এর set।

ইতোমধ্যে আপনি গুণন ও ভাগের ক্ষেত্রে ০ এর ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করেছেন। আপনি এও সংজ্ঞায়িত করেছেন যে দু'টি বিয়োগবোধক সংখ্যার গুণফল হবে যোগবোধক। ফলে:

$$(-x) \times (-x) = x^2$$

---

21 প্রমাণের জন্য দেখুন The Beauty of Mathematics. এই প্রমাণের মূল ভিত্তি হলো 'আত্মবিরোধ', যা এই বইয়ের প্রমাণ-পদ্ধতির মৌলিক হাতিয়ারগুলির মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করতেন যে যেহেতু rational field এর মধ্য থেকে $\sqrt{২}$ আত্মবিরোধের জন্ম দিচ্ছে সেহেতু এটি কোনো সংখ্যাই নয়, তাহলে আপনার উক্ত rational field টাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে বিবেচিত হতো না। কারণ তা যে-সমস্যার জন্ম দিতে পারত তা ও সমাধান করতে পারত না। কিন্তু আপনার বিশ্বাস ছিল যে *সমস্যা চিরকাল সত্য, এবং তার সমাধান থাকতেই হবে।* ফলে আপনি আপনার field টাকেই বিস্তৃত করলেন।

22 উক্ত বইটি দেখুন।

যেমন: (-২) × (-২) =৪

এবং (২) × (২) = ৪ একই

বিপরীতক্রমে:

$\sqrt{৪}$ =২ বা -২

যে-কোনোটি হতে পারে। কিন্তু এক দিন এক গণিতবিদ আপনাকে $ax^2 + b = 0$ সমীকরণটি এনে দেখালেন, যেখানে $\frac{b}{a}$ এর মান পাওয়া যাচ্ছে ঋণাত্মক।

অর্থাৎ:

$$ax^2 + b = 0$$

$$ax^2 = -b$$

$$x^2 = -\frac{b}{a}$$

$$x = \pm\sqrt{-\frac{b}{a}}$$

$\frac{b}{a} = m$ ধরলে-

$$X = \pm\sqrt{-m}$$

এখানে আপনি পড়লেন ঝামেলায়। আপনি দেখেছেন যে, উদাহরণস্বরূপ, (-২) × (-২) = (+৪) এবং ২ × ২ = (+৪)। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে গুণফল ধণাত্মক। কোনোক্রমেই ঋণাত্মক গুণফল পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ, $\sqrt{m} = \pm n$ হলে, $n \times n = m$ এবং $(-n) \times (-n) = m$ পাওয়ার কথা। ঋণাত্মক m কিভাবে পাওয়া যাবে?

কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে আপনি বললেন যে ঋণাত্মক কোনো সংখ্যার বর্গমূল হয় না। আপনি আরো ঘোষণা করলেন: যেহেতু এরূপ সংখ্যার বর্গমূলকে প্রকাশ করার জন্য কোনো সংখ্যা আমাদের সংখ্যারেখায় নেই, সেহেতু কোনো সমীকরণের সমাধান এরূপ পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে আসলে তার কোনো সমাধান নেই। এরূপ সংখ্যাকে আপনার তেমন পছন্দ হলো না এবং আপনি তার নাম রাখলেন সংখ্যার ছায়া বা কাল্পনিক সংখ্যা (imaginary number)।

কিন্তু আপনার সংখ্যারেখার সরু মাঠের ওপর দিয়ে কিছু কিছু সমীকরণের বেয়াড়া ঘোড়া যখন দৌড়ে যেতে থাকে, তখন কিছু কিছু গর্তে তাদের পা আটকে যাওয়াতে তারা হোঁচট খায়। আপনি অলৌকিক রাবারের তৈরি

সংখ্যারেখাকে আরো জোওে টেনে পরখ ক'রে দেখতে লাগলেন তাতে নোতুন কোনো ধরনের সংখ্যার জন্য কিছু গর্ত খালি প'ড়ে আছে কি না। কিন্তু, নেই।

তাহলে ঘোড়াগুলো অমনভাবে হোঁচট খাচ্ছে কেন?

পর্যবেক্ষণ ক'রে আপনি নিশ্চিত হলেন যে ওরা আসলে সংখ্যারেখার কোনো গর্তে প'ড়ে যাচ্ছে না- কারণ তাতে আর কোনো ফাঁকা গর্ত নেই। আসলে ওরা রেখাটাতেই থাকতে চাচ্ছে না-পার্শ্ববর্তী তলের (plane) দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যাচ্ছে হয়তো।

আপনি বুঝতে পারলেন যে সরু সরলরৈখিক মাঠে এই কাল্পনিক সংখ্যাগুলি দৌড়াতে পারে না। তাদের চাই প্রশস্ত দ্বিমাত্রিক (two-dimensional) তল (plane)। আপনি মাথার অনেকগুলো চুল ঝরানোর পর বুঝতে পারলেন যে $\sqrt{-m}$ জাতীয় সংখ্যার বর্গমূল আছে বটে, তবে যদি তাকে জোর ক'রে বর্গমূল বলা হয়। জোর আপনাকে করতেই হলো, কারণ আপনি আপনার সংখ্যার সিস্টেমটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আকারে দেখতে চান। ফলে আপনি 'ধ'রে নিলেন' i^2 = -১, এবং $i = \sqrt{-১}$। এখন একটি সংখ্যার নাম হয়ে গেল i - যার কোনো পরিমাণ ব'লে কিছু নেই। একে সংখ্যা নামে অভিহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত চিন্তা এবং সাহস আপনার ছিল। ফলে, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আপনার সেই 'উদ্ভাবনই' এক সময়ে আসল সত্য ব'লে বিবেচিত হলো। বুঝতে পারলেন যে তা কোনো উদ্ভাবন ছিল না, ছিল রীতিমতো আবিষ্কার। যা আগে থেকে ছিল আপনি তাই খুঁজে পেয়েছিলেন। আপনি দেখলেন যে আপনি এরূপ সংখ্যাকে কার্তেসীয় (পদ্ধতিটির উদ্ভাবক দার্শনিক এবং গণিতবিদ Descartes (১৫৯৬-১৬৫০) এর নাম অনুসারে) স্থানাংকের সিস্টেমে একেকটি বিন্দুর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন। আপনি $\sqrt{-১}$ কে i দ্বারা চিহ্নিত ক'রে যে-কোনো এরূপ রাশিকে প্রকাশ করতে শিখলেন:

$$\sqrt{-৪} = \sqrt{৪} \times \sqrt{-১} = ২ \times \sqrt{-১} = ২\,i$$

$$\sqrt{-৭} = \sqrt{৭} \times \sqrt{-১} = \sqrt{৭}i$$ ইত্যাদি।

এর সাথে সমীকরণ থেকে উঠে আসা অন্য সংখ্যাও যুক্ত থাকতে পারে, যার ফলে এর সাধারণ রূপ হয় a + bi আকারের, যেখানে a ও b হলো real number এবং i হলো unit imaginary number বা $\sqrt{-১}$ এর মান। আপনি a + bi আকারের সংখ্যাগুলির নাম রাখলেন complex number। আপনি দেখতে পেলেন যে পূর্বে আবিষ্কৃত সব real number ই complex number এর একেকটি বিশেষ রূপ, কারণ a + bi এর b =0 হলে থাকে শুধু a, যা হলো একটি real number।[২৩]

[23] কার্তেসীয় স্থানাংক সিস্টেম নিম্নরূপ:

এখন আপনি আপনার দ্বিমাত্রিক মাঠের নাম রেখেছেন complex plane। এবং এখন আপনি নিশ্চিত যে সৃষ্টি জগতে যত ধরনের সংখ্যা আছে (অর্থাৎ natural, whole, rational, irrational- সবাইকে একত্রে real, এবং complex) তাদের দুই বা ততোধিককে '+', '-', '÷', '×' দ্বারা যতভাবেই সমন্বিত করা হোক, তার ফল হিসেবে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে তা এই complex field/plane-এ অবশ্যই আছে।

অর্থাৎ আপনার মাঠের সব বিন্দু দিয়েই এখন আপনার গাণিতিক সমন্বয়ের যুক্তির ঘোড়া দৌড়ায়।

অন্য কথায়, তা যেদিকেই দৌড়াক, মাঠ অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেই।

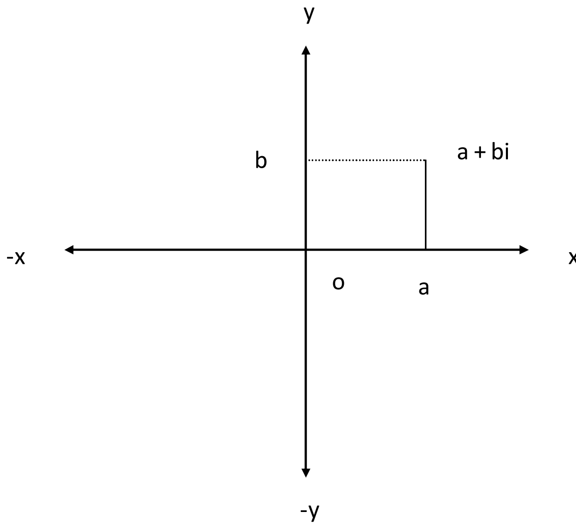
অর্থাৎ, মাঠটি *স্বয়ংসম্পূর্ণ* শুধু নয়, তা *সীমিতও।*

স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লেই তা *সীমিত।*

তা *সীমিত* ব'লেই *স্বয়ংসম্পূর্ণ।*

তাতে সংখ্যার সংখ্যা অসীম, তবে সংখ্যার প্রকার সীমিত। *সমন্বয়ের* (operation) রীতি সীমিত- অর্থাৎ তা কেবল '+', '-', '÷', '×' এর নিশ্চয়তা দেয়।

এর বাইরে অন্য কোনো *সমন্বয়ের* প্রক্রিয়া যদি মানুষের জানা থাকত তাহলে তার ফল আর এই field এর মধ্যে থাকত না।



পরস্পর লম্ব দুটি রেখা নেয়া যাক, যাদের একটিকে x-অক্ষ এবং অপরটিকে y-অক্ষ ব'লে অভিহিত করা হবে। এদও ছেদবিন্দু হলো 0। a + bi আকারের সংখ্যাকে এই plane-এ স্থাপিত করতে হলে x অক্ষে 0 থেকে a পরিমাণ দূরত্বে (a যোগবোধক হলে ডান দিকে এবং বিয়োগবোধক হলে বাম দিকে) একটি বিন্দু নিতে হবে। এবার একইভাবে b- এর সমান দূরত্বে 0 থেকে y অক্ষে একটি বিন্দু নেয়া যাক। এবার a বিন্দুর মধ্য দিয়ে y অক্ষের সমান্তরাল ক'রে এবং b বিন্দু দিয়ে x অক্ষের সমান্তরাল ক'রে দুটি রেখা আঁকা যাক। এই রেখা দুটির ছেদবিন্দুই হলো a + bi নির্দেশক বিন্দু। এভাবে অক্ষ দুটির প্রতিটি চতুর্ভাগের প্রতিটি বিন্দুর জন্যই সংখ্যা complex plane-এ আছে। লক্ষ্যণীয়: a + bi এর b = 0 হলে সংখ্যাটি বসবে x অক্ষের ওপর; এবং a = 0 হলে (এবং b ≠ 0 হলে) তা বসবে y অক্ষের ওপর। ফলে complex plane এর প্রতিটি অদৃশ্য বিন্দুতে আছে একেকটি complex সংখ্যা।

যেহেতু সব ধরনের সংখ্যার সাথে সব ধরনের সমন্বয়ের সব ধরনের সম্ভাব্য ফলই এতে আছে, সেহেতু একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে এই সব সংখ্যা এবং সমন্বয়কে প্রয়োগ ক'রে কোনো দিনও এই plane এর বাইরে যাওয়া যাবে না।[২৪]

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করছেন, "এর বাইরে আর কোনো space থাকলে তো? সৃষ্টিজগতের সম্ভাব্য সব ধরনের space ই এর আওতাভূক্ত।"

কিন্তু, প্রিয় পাঠক, যদি থাকে? *আপনি যেতে পারছেন না ব'লে কি এটি প্রমাণিত হয় যে এই মাঠের বাইরে আর কোনো মাঠ নেই?* না, তা হয় না। সেখানে না গিয়ে আপনি নির্ভুলভাবে কিভাবে বুঝবেন তা আছে কিনা? আপনি কিভাবে natural number এর সেট থেকে পর্যায়ক্রমে whole number, rational number, real number, এবং অবশেষে complex number এর সেটে উপনীত হয়েছেন তা মনে নেই? যেমন -৪, -৩, -২, -১, ০, ১,২, ৩, ৪, ...-এই field এ শুধু '+' এবং '-' প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে আপনি অনন্তকাল পরেও তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না। যখনই আপনার প্রয়োজন হলো '÷' প্রক্রিয়ার, তখনই আপনি তা থেকে rational field এ যাওয়ার সুযোগ পেলেন। এখন, এমনও তো হতে পারে যে, এমন ধরনের যুক্তি বা operation আছে যা +, -, ÷, × এরও বাইরে-এমনকি মানুষের প্রতিষ্ঠিত যুক্তিরও বাইরে পড়ে, এবং তা প্রয়োগ ক'রে complex plane থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক plane-এ পৌঁছে যাওয়া যায়। অর্থাৎ complex field ও *শাশ্বতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়,* তার *উল্টো পিঠের তলে* যে field টি রয়েছে তাও এক ধরনের field। আসলে তা আছেও। Complex field টিকেও তো আপনি গায়ের জোরে বানিয়ে নিয়েছিলেন, নয় কি? অথচ তাই-ই এখন গণিত ও বিজ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে।

আরো এগুনোর আগে এই মাঠটিকে একবার কুয়োর সাথে তুলনা করা যাক: complex field টা হলো একটি কুয়ো। আমরা সবাই ব্যাঙ। আমরা ১, ২, ৩, ৪,ইত্যাদিও ওপর ভর ক'রে '+', '-', '÷', '×'-এই কুয়োর মাপের লাফগুলো দিচ্ছি। ফলে কুয়ো থেকে বের হতে পারছি না। কিন্তু কুয়োর বাইরে সাগর আছে। সেখানে আমরা কোনো দিনই যেতে পারব না, কারণ লাফানোর অন্য কোনো কৌশল আমাদেও জানা নেই। আমাদের যুক্তিতে সে সাগর কুয়োর মাপের সাগর। কিন্তু প্রকৃত সাগরের আমরা প্রমাণ করতে পারব।

একটি ছোট গাণিতিক উদাহরণও নেয়া যাক। তিনটি রাশি নেয়া যাক: ১, $\frac{১}{২}(-১ + \sqrt{-৩})$, $\frac{১}{২}(-১ - \sqrt{-৩})$। আপনাকে যদি বলা হয় যে গুণন-প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না, তাহলে আপনি এই সংখ্যাগুলিকে নিয়ে আজীবন হিসাব ক'রেও এদের বাইরে অন্য কোনো সংখ্যায় যেতে পারবেন না। যেমন, তিনটি সংখ্যাকে এ সাথে গুণন করলে গুণফল হবে ১, যা এখানে আছে। দ্বিতীয় সংখ্যা দুটির গুণফল হবে ১। প্রথমটির বর্গ হবে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টির বর্গ হবে প্রথমটি। সুতরাং গুণনের লাফ দিয়ে এই কুয়ো থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি গুণনের বাইরে কিছু না জানতেন তাহলে কি আপনার বলা উচিত হতো যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এদের বাইরে অন্য কোনো রাশি নেই? কিন্তু দেখুন: যোগ প্রক্রিয়ায় এখান থেকে বের হওয়া যায়। এদের যোগফল শুণ্য!

---

[24] আরো অনেক ধরনের mathematical structure আছে এবং সব ক্ষেত্রে এরূপ কথা প্রযোজ্য।

তাহলে আমরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার (completeness) একটি সরল অথচ মৌলিক সংজ্ঞা দেবার জন্য প্রস্তুত:

কোনো সিস্টেম যে-সমস্যার জন্ম দিতে পারে তা যদি তার সমাধান দেবারও যোগ্যতা রাখে, তাহলে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সিস্টেম বলে। আরেকটু যৌক্তিক ভাষায়, কোনো সিস্টেম যে-প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে তা যদি তার ফলও ধারন করে, তাহলে বলা হয়? যে সিস্টেমটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিংবা আরো গাণিতিক ভাষায়, কোনো সিস্টেমের যে-কোনো উপাদানের সাথে তার যে-কোনো উপাদানের যে সম্পর্ক, তার সমগ্রের সাথেও উক্ত যে-কোনো উপাদানের যদি সেই সম্পর্ক কার্যকর থাকে তাহলে বলা হয় যে সিস্টেমটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পুনর্বিবেচনা ক'রে বলা যায়, complex plane এর যে-কোনো সংখ্যার সাথে অন্য যে-কোনো সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ এই সমন্বয়-ক্রিয়াগুলির ফলে উদ্ভূত সংখ্যাও হবে একটি সংখ্যা যা উক্ত complex plane এর সদস্য। অর্থাৎ সম্পর্কে তারা পরস্পর সহোদর। এমনকি অসীম পর্যন্ত এরূপ যাবতীয় সংখ্যাকে কোনো কায়দায় সমন্বিত করলেও যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে (যদিও তা এখন আর কোনো সংখ্যা নয়, সংখ্যার একটি ধারণামাত্র), তাও উক্ত plane এর একটি সদস্য। অর্থাৎ পুরো plane টি নিজেই নিজের ভাই!

ব্যাপারটিকে আত্মবিরোধী ব'লে মনে হচ্ছে না? কিন্তু একানো কোনো আত্মবিরোধ নেই। আত্মবিরোধ হলো মূলত সম্পর্কের ঐক্যের ধ্বংস। এখানে সেরূপ কোনো ধ্বংস-সাধন হয়নি। ফলে, ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর কোনো আত্মবিরোধ চোখে পড়বে না। তাছাড়া complex plane এর *যাবতীয়* সংখ্যাকে যোগ করলে কোনো সংখ্যাই পাওয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে পাওয়া যায় উক্ত plane টিকেই, যা হলো একটি ধারণা-অর্থাৎ স্বয়ং সিস্টেমটিই।

কিন্তু আত্মবিরোধের ধারণা আসে তখনই যখন বলা হয় যে plane টি আবদ্ধ, অর্থাৎ সীমিত। মনে প্রশ্ন জাগে: *যার মধ্যে সব আছে, তার বাইরে আবার কিছু থাকে কিভাবে?* তার বাহির বলেই তো কিছু নেই।

কিন্তু তার বাইরেও কিছু আছে। কারণ যে-যুক্তির ওপর উক্ত সিস্টেমটি প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তির system বা space টিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার একটি কিনার আছে। সে ঐ কিনারের বাইরে যেতে পারে না। যেতে চায় না। আমরাও তার উক্ত সীমার মধ্যে থাকি ব'লে, এবং থাকতে চাই ব'লে, ভেতরের সবকিছুকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব'লে মনে করি। এবং তার বাইরে যেতে হলে সে-যুক্তি আর 'যুক্তি' থাকে না ব'লে, 'যুক্তিশীল' জীব হিসাবে আমরা তার বাইরে যেতেও চাই না। যখনই আমরা তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করি, তখনই তা অযৌক্তিক আচরণ করে, অর্থাৎ আত্মবিরোধের জন্ম দেয়। তখন আমরা তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার মধ্যেই থেকে যাই।

আসলে তার বাইরেও যাওয়ার জায়গা আছে। তবে সেখানে যেতে হলে সেই যুক্তিকে পেছনে ফেলে যেতে হয়। জীবিত অবস্থায় একবার যদি সেখানে যাওয়া সম্ভব হতো, তাহলে আর অপর প্রান্তে গিয়ে আমরা মনে করতে পারতাম না আগে কোথায় ছিলাম কিংবা আদৌ কোথাও ছিলাম কিনা, কারণ *সেই যুক্তির অস্তিত্বের কথা মনে রাখা যায় কেবল সেই যুক্তির সাহায্যেই*। তা না থাকলে তার অস্তিত্বের স্মৃতিও আর থাকেনা-অন্তত এটুকু সত্য যে তা আর *অর্থপূর্ণ থাকে না।*

এটাই তো আত্মবিরোধ-যাওয়া সম্ভব, অথচ যাওয়ার পর আর বুঝা সম্ভব নয় অন্য কোনো স্থান থেকে আদৌ সেখানে গিয়েছিলাম কি না। পাগল হয়ে যাবার পর পাগল কি বলে সে যে পাগল? যদি বলে, তাহলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। সে পাগল ঠিকই, তবে *তার সংজ্ঞা* অনুসারে নয়। হয়তো সে তার সংজ্ঞা অনুসারে সুস্থ, তবে কোনো *সুস্থ ব্যক্তির* সংজ্ঞা অনুসারে নয়। সে কি বলতে পারে পাগল হবার আগে সে সুস্থ ছিল কি না? পারে না। পারলে সে খাঁটি পাগল নয়। এবং কেউ তা বিশ্বাসও করবে না, কারণ সে তার পাগল হওয়ার আগের সুস্থতার অবস্থাকে বিশ্লেষণ করছে পাগলামিপূর্ণ অসুস্থ যুক্তি দিয়ে। আসলে সে সুস্থ অবস্থার যুক্তিকে অতিক্রম ক'রে যেই পাগল হয়েছে, অমনি সে ভুলে গেছে যে আগে কোথায় ছিল। কারণ সে আগে কেমন ছিল তা মনে রাখতে হলে তার মনে আগের সেই যুক্তিও বলবৎ থাকতে হবে। কিন্তু তা এখন আর তার মধ্যে নেই। যদি থাকে, তাহলে সে পাগল নয়, ডাক্তার যতই বলুন।

পাগলের কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে যে পাগল বলে, সেও পাগল।

মানুষের জ্ঞানের সবচেয়ে বড় *সীমাবদ্ধতা হলো এই যে তার নিয়মের ওপর নির্ভরশীল, তা যে-যুক্তির দ্বারা অর্জিত সেই যুক্তির ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।* তার জ্ঞান ততক্ষণ বৈধ, যতক্ষণ ঐ যুক্তিও বৈধ। একইভাবে, মানুষের যুক্তির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো এই যে তা যে-জ্ঞানের সৃষ্টি করে, সে-জ্ঞানকেও সে পুরোপুরি নিজের নিয়মে বিশ্লেষণ করতে পারে না। যখন সে তা পারে না, তখন সে উক্ত জ্ঞানকে আর জ্ঞান বলে না, অথচ নিজেকে যুক্তিযুক্ত ব'লেই পরিচয় দিতে চায়। তখন তার নিজের সাথেই নিজেই বিরোধ লেগে যায়। আত্মবিরোধ কাহাকে বলে!

সৃষ্টিকর্তার অস্তিতের প্রমাণ

আসলে *যুক্তি নিজেই নিজের ওপর দিয়ে বেশিক্ষণ দৌড়াতে পারে না।* তা মুক্তপ্রান্ত (open-ended)। প্রান্তে গিয়ে সে নিজের সাথে নিজে মেশেনি। তার দুটি চোখ-এক চোখ যখন অপর চোখের দিকে তাকায়, তখন একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ফলে সে নিজেকে দেখতে পায় না। তার তো আর দেহ নেই। আছে শুধু এক জোড়া চোখ।

যখন সে নিজেকে দেখতে পায় না, তখন সে নিজের ছায়াকে দ্যাখে। এবং ভেবে বসে যে সে বেঁচে আছে। কিন্তু সে বিশ্বাস করতেই চায় না যে সে তখন মৃত। মৃত্যুর পর কি কেউ নিজেকে নিজে দেখতে পারে? এই ধাঁধাঁই তাকে জীবিত ক'রে তোলে।

'যুক্তিশীল' মানুষ যুক্তির এই মরা-বাঁচাকে দেখতে পায় না। কারণ সে যুক্তি দিয়েই যুক্তিকে দ্যাখে। এবং ফলে সে তাকে তখনই দ্যাখে যখন তার যুক্তি আবারও বেঁচে ওঠে। আত্মবিরোধের মুহূর্তে যুক্তির এই মৃত্যুকে সে দেখতে পায় না ব'লে সে শুধু আত্মবিরোধটাকেই দ্যাখে, এবং ভাবে যে আত্মবিরোধটা সত্য, অর্থাৎ যুক্তি সত্য, অর্থাৎ যার সাথে আত্মবিরোধ তা মিথ্যা।

এভাবে আত্মবিরোধই যুক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। অর্থাৎ যুক্তির মৃত্যুর ভয়ই যুক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। যুক্তি ভাবেঃ মরে বেঁচেছি। অথচ যুক্তিবিদ তখনও বেঁচেও ম'রে আছেন। প্রিয় পাঠক, আমার কথাগুলিকেও কি আত্মবিরোধী ব'লে মনে হচ্ছে? যদি হয়, তাহলে তা হচ্ছে উক্ত মৃত যুক্তিরই কারণে। প্রমাণ দিচ্ছি।

আমি একটু আগেই বলেছি যে, পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ complex plane এর বাইরেও অন্য কোনো plane আছে। আপনি হয়তো কথাটি মেনে নিতে পারেন নি। মনে মনে প্রশ্ন তুলছেনঃ বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে তাও এর মধ্যে আছে। অর্থাৎ বাইরে নেই।

অত্যন্ত সুন্দর জবাব, যদিও ভুল। আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার নিজের যুক্তি অনুসারেই তা ভুল (আত্মবিরোধ!)।

তা যে ভুল তা দেখাবার জন্য একটা পাল্টা প্রশ্ন করিঃ পুরো complex plane টি কি তার নিজের মধ্যে আছে? আপনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি আবারও বললাম, তাহলে তো এখন তার আকৃতি বেড়ে গেল। নিজেকে খেয়ে সাপটি এখন দ্বিগুণ মোটা হয়ে গেল। তাহলে এই দ্বিগুণ মোটা সাপটিও কি আগের সাপটির মধ্যে আছে?

প্রশ্নটি আপনার কাছে এত ভূতুড়ে ধরনের ভালো লেগেছে যে এর জবাব দেবার ইচ্ছা আপনার নেই। কিন্তু এই আনন্দ ভূতুড়ে ব'লেই গায়ের রোম যখন আর খাড়া থাকবে না তখন যুক্তি এসে আপনাকে আবারও জয় ক'রে নিবে। ফলে বলবেন, এ তো পুরোপুরি আত্মবিরুদ্ধ। সে *নিজের মধ্যে নিজে নেই।*

দেখুন তো, এখন আপনিই তো প্রমাণ ক'রে দিলেন যে তার *বাইরেও সে আছে!*

এই সমস্যার দুইটাই সমাধান আছে: এক, এরূপ প্রশ্নে কান না দেয়া (ধার্মিকরা যে উপায় অবলম্বন করেন), এবং দুই, যুক্তিকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করা (যা ধার্মিকরা করতে চান না, কারণ তাঁরা যুক্তি দিয়েই ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করতে চান)। আপনি কোন পথ বেছে নিবেন?

ব্যক্তিগতভাবে আমি বলতে চাই যে, *আমি কোনো পথই বেছে নিব না।*

এবার আপনি আবারও আত্মবিরোধের গন্ধ পাচ্ছেন। বলছেন দুটিই মাত্র পথ, অথচ কোনোটাই বেছে নিবেন না। তা কিভাবে হয়? তাহলে কি আপনি সমস্যাটির সমাধান চান না?

অবশ্যই চাই। ফলে, *আমি উভয় পথই বেছে নিব।*

এবার সম্ভবত আপনি হেসে ফেলছেন, যদি সহিষ্ণু ব্যক্তি হন, কিংবা রেগেই গেছেন, যদি যুক্তিবিদ হয়ে থাকেন।

কিন্তু আমি আমার মতে অটল। কারণ আমার কাছে সমস্যাটিকে কোনো সমস্যাই মনে হয়নি। সমাধানের পর যদি দেখা যায় যে সমস্যা আর সমস্যা নেই, তাহলে তাকে কি আপনি সমাধান বলবেন? প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর আপনি যদি পেছনে ফিরে তাকিয়ে দ্যাখেন যে প্রশ্ন আর প্রশ্ন ছিল না, তাহলে কি আপনি কোনো জবাবই দিয়েছিলেন?

আমি যদি প্রমাণ ক'রে দেই যে *আত্মবিরোধ ব'লেই কিছু নেই*, তাহলে কি সমস্যা আর সমস্যা থাকবে? তাহলে কি কোনো উত্তরের প্রয়োজন হবে? এবং কোনো প্রশ্নের?

যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার বাইরে কিছু থাকতে পারে না। এ হলো যুক্তির কথা। কিন্তু *কোন যুক্তি অনুসারে কথাটা সত্য?*

যার বাইরে কিছু থাকতে পারে না, তার ভেতরে সে নিজেই নেই। এও কি যুক্তির কথা? সে কি তাহলে একই space এ ভিন্ন *time* এর কবলে প'ড়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে? এখানে সময় এবং *দুইভাগ*-এর ধারণা দুটি আমাদের পরবর্তী কাজে লাগবে।

রাসেলের ধাঁধাঁটিই ধরা যাক। Z হলো সেই সেটগুলির সেট যারা নিজেরা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অর্থাৎ যারা নিজেরা নিজেদের সদস্য নয়। মানব চিন্তায় এরূপ যত সেট থাকা সম্ভব তার সবগুলি Z এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে Z কি নিজের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ Z এর মধ্যে কি সে নিজেই আছে?

যদি বলা হয়, হ্যাঁ আছে, তাহলে সে নিজের মধ্যে নেই, কারণ কেবল এমন সেটগুলোই তার মধ্যে থাকতে পারে যারা নিজের অন্তর্ভূক্ত নয়। আবার যদি বলি, না, নেই, তাহলে সে নিজেই নিজের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এরূপ যাবতীয় সেটই তার মধ্যে আছে। সৃষ্টি হলো আত্মবিরোধের। সমাধান কী?

লক্ষ্য করুন, আপনি যেই 'হ্যাঁ' তে যাচ্ছেন, অমনি আপনার যুক্তি চ'লে যাচ্ছে 'না' তে। আবার আপনি যেই 'না' তে চ'লে যাচ্ছেন, অমনি আপনার যুক্তি চ'লে যাচ্ছে 'হ্যাঁ' তে। একেই বলে খাঁটি আত্মবিরোধ। কিন্তু যদি

প্রমাণ করা যায় যে এই যুক্তি নিজের সাথে নিজে বিরোধিতা করে, এবং সেজন্যে তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ তার কুয়ো থেকে সে বাইরে যেতে পারে না, তাহলে কি উক্ত প্রশ্নের জবাবে পাওয়া যাবে যে সৃষ্টিকর্তা ব'লে কেউ নেই?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সেট থিওরি সম্পর্কিত এই ধাঁধাঁটি রাসেল নিজে তৈরি করলেও তিনি নিজেই তার সন্তোষজনক সমাধান দিতে পারেননি।[২৫] অর্থাৎ তাঁর যুক্তি *স্বয়ংসম্পূর্ণ* নয়- কারণ তার মধ্যে থেকে তিনি যে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেন, তার মধ্যে থেকে তিনি তার সমাধান দিতে পারেন না।

এই ধাঁধাঁটির অনুরূপ একটি ধাঁধাঁ বেশ প্রচলিত আছে, যা বুঝতে পারা আরো সহজ। তা এরূপঃ এক শহরে এক নাপিত আছে। ঐ শহরের যত লোক নিজের দাড়ি কামায় না তাদের *সবার* দাড়ি সে কামায়। তাহলে সে কি নিজের দাড়ি কামায়?

যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে সে নিজের দাড়ি কামায় না, কারণ তার নিয়মইতো শুধু সেই লোকেদের দাড়ি কামানো যারা কখনই নিজেদের দাড়ি কামায় না। আবার যদি বলি না, তাহলে সে নিজের দাড়ি কামায়, কারণ নিজের দাড়ি কামায় না এমন সব লোকের দাড়িই তো তাকে কামানোর কথা, আর সেও তো ঐ শহরের সব লোকেদের মধ্যে এক জন। আত্মবিরোধ। আপনি যাচ্ছেন 'হ্যাঁ' তে, আপনার যুক্তি আপনাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে 'না' তে-এবং উল্টোভাবেও।

এখন দেখা যাক এরূপ ধাঁধাঁকে solve করতে হবে নাকি dissolve করতে হবে।একে solve করা সম্ভব নয় যদি যে-যুক্তির ওপর ধাঁধাঁটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে শ্বাশ্বত ব'লে ধরে নেয়া হয়। আর যদি প্রমাণ করা যায় যে তা শ্বাশ্বত নয়, তাহলে ধাঁধাঁটিকে dissolve করতে হবে, অর্থাৎ তা আর ধাঁধাঁই থাকবে না। তখন যে-যুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে তাতে সবই সত্য, *তাতে আত্মবিরোধ ব'লে* কিছু নেই, *তাতে মহাসেট Z নিজেও নিজের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে,* কোনো শর্তই নাপিতকে নিজের এবং অন্যের দাড়ি কামানো থেকে বিরত রাখতে পারে না, তখন সাপটি নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলতে পারবে এবং তার পরও সে বেঁচে থাকবে, তখন সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংসও করতে পারবেন -কোনোরূপ অক্ষমতার গ্লানি তাকে বইতে হবে না, এবং একই সাথে তখন তাকে কোনোরূপ নশ্বরতার গ্লানিও বইতে হবে না-কারণ নিজেকে ধ্বংস করার পরও তিনি অক্ষত থাকবেন। তখন এক মেরু বিশিষ্ট চুম্বক পাওয়া যাবে, এক হাতে তালি বাজানো যাবে, নিজেই নিজের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ানো যাবে। তখন সম্ভব আর অসম্ভব, সত্য আর মিথ্যা, ভালো আর মন্দ, গতকাল আর আজ আর আগামীকাল, ধ্বংস আর সৃষ্টি- সবই একই তলে অবস্থান করবে, একটি অপরটির বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে না।

প্রকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণতা হলো আত্মবিরোধহীনতা। গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারণ তার নিজের প্রয়োজন সে নিজেই মেটাতে সক্ষম। নিজের যে-কোনো প্রশ্নের জবাব সে নিজেই জানে।

হয়তো যুক্তিবিদ এখন সন্দেহ তুলবেন, "এরূপ কোনো নাপিত থাকতে পারে না, কারণ তার থাকা উচিত নয়।"

---

[25] *দেখুন, অন্ধকারের বস্ত্রহরণ।*

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারো থাকা না থাকা অন্য কারো উচিত অনুচিতের ওপর নির্ভরশীল নয়।

"কিন্তু", তিনি আবারও প্রতিবাদ করবেন, "তার *নিজের* উচিত অনুচিতের ওপর তার থাকা না থাকা নির্ভরশীল।"

আমি বলব, না, আদৌ নয়। তার *অস্তিত্বই* তার উচিতকে তৈরি করে। এরূপ নাপিত থাকা সম্ভব-যা সম্ভব নয় তা হলো তার ওপর আরোপিত *শর্তগুলি। যদি আপনার শর্তগুলিকে আপনি যুক্তিযুক্ত বলতে চান, তাহলে নাপিতকেও যুক্তিযুক্ত বলতে হবে। তাকে মিথ্যা বললে শর্তগুলিকে বলতে হয় এমন আইন যা প্রণয়ন করা হয় তার জন্য যার কোনো অস্তিত্বই নেই।*

এখন, শর্ত থাকলে নাপিত থাকতে পারে না; নাপিত থাকলে শর্ত থাকতে পারে না। এটাই তো একটি আত্মবিরোধ, অথচ আগেরটি এখন আর কোনো আত্মবিরোধ নয়। আপনার লজিককে ঠিক রেখে আপনি যদি আত্মবিরোধের নিস্পত্তি করতে চান তাহলে আরেকটা আত্মবিরোধের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। আপনার লজিক তার প্রান্তে গিয়ে আত্মবিরোধের জন্ম দেয় অন্য কোনো লজিকে পৌঁছে যাবার জন্য।

নাপিত আছে। তাহলে কি আপনি এখনও শর্তগুলি আরোপ ক'রে বলতেই থাকবেন সে নেই? নিজের চোখ বুজে কি প্রমাণ করা যায় আপনার সামনে যে ব'সে আছে সে আসলে নেই?

কিংবা আপনি কি চোখ বড় বড় ক'রে খুলে রেখে প্রমাণ করতে চান যে আপনি যাকে দেখতে পাননি সে আসলে নেই? নিজের চোখের ব্যাপারে কি কোনো প্রশ্নই তুলবেন না? আপনার যুক্তি কি সত্যই শ্বাশ্বত?

সভ্যতার শুরু থেকেই এই পর্যন্ত সব দার্শনিকই মনে করেছেন যে যুক্তি স্থান-কাল-পাত্রহীন, শ্বাশ্বত (universal)। কিন্তু যুক্তি শ্বাশ্বত নয়!

যুক্তি সময়নির্ভর।

যুক্তি স্থান নির্ভর।

বাংলাদেশের যুক্তি ব্রিটেনে যুক্তরাষ্ট্রে এমনকি চাঁদের দেশেও সত্য, আজকের যুক্তি আগামীকালও সত্য থাকবে-যদি তা বিশুদ্ধ যুক্তি হয়, কিন্তু স্থান-কাল ব'লে যদি কিছু না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে মানবীয় যুক্তির গতানুগতিক রূপও আর থাকার কথা নয়।

যুক্তির দুটিই মাত্র চোখ, অথচ সে একই সময়ে দুটি চোখ দিয়ে কোনো কিছুকে দেখতে পারে না। সে এক মুহূর্তে কেবল একটি চোখ দিয়েই দেখতে পায়। তার এক চোখ যা দ্যাখে, তার অপর চোখটি তার উল্টোটাই দ্যাখে। ফলে সে বৈধভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার এই অক্ষমতার (অর্থাৎ দুটি চোখ দিয়ে এক সাথে দেখতে না পারার) কাছে ঋণী।

যুক্তির এক চোখ আছে এক তলে, তার অন্য চোখটি আছে ঠিক বিপরীত তলে। ফলে তা একটি বিশেষ মুহূর্তে শুধু বাস্তবতার একটি তলই দেখতে পায়।

আসলে বাস্তবতার একটিই তল-দুই তল ব'লে তাতে কিছু নেই। কিন্তু দুই চোখ দিয়ে এক সাথে তাকে দেখতে না পারার কারণে যুক্তি তাকে খণ্ডিত অবস্থায়ই দ্যাখে, এবং ভেবে বসে যে তার দুটিই তল।

যুক্তির সফলতা তার পূর্বধারণার (assumption) ওপর নির্ভরশীল। সে শুরু হতে জানে না। তাকে শুরু করিয়ে দিলে কেবল সে চলতে পারে। চলার পথে তার এক চোখ অপর চোখের দেখা পেলে সে থেমে যায়-তখন ক্ষণে ক্ষণে তার এক চোখ জ্ব'লে অন্যটি নিভতে থাকে। তখন সে 'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে 'না' ব'লে ফেলে, 'না' বলতে গিয়ে 'হ্যাঁ' ব'লে ফেলে। তার এক চোখের নাম 'না', এক চোখের নাম 'হ্যাঁ'। একটি অস্তিত্ব, অন্যটি অনস্তিত্ব। ফলে তার এক চোখ অনুসারে যা আছে, অন্যটি অনুসারেও তা আছে, কারণ অন্যটি তখন অন্ধ, সে আগেরটির রায়কে মেনে নিচ্ছে। *ফলে যা আছে, তা নেই হতে পারে না*, এবং বিপরীতক্রমে, *যা নেই তা থাকতে পারে না।* এ শুধু তার দেখার ব্যাপার। বাস্তবতায় সবই আছে-একই সাথে একই মুহূর্তে 'অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব' ও আছে, তাওবাদের (Taoism) এই প্রতীকটির মতোঃ



চিত্র-৫

এখানে অস্তিত্ব (সাদা) এবং অনস্তিত্ব (কালো) একই তলে মিশে আছে। একটিমাত্র তলে এরূপ কোনো মেশিন তৈরি করা সম্ভব নয়, কারণ তা হ্যাঁ-না যুক্তিকে, অর্থাৎ, 0-1 যুক্তিকে, অস্বীকার করে। কিন্তু চিন্তায়-মুক্ত চিন্তায়-তার অস্তিত্ব আছে। কমাসদৃশ জিনিস দুটিকে যদি আলোর চলার গতিতে ঘুরানো হয়, তাহলে, আইনিস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে, তা *একই সময়ে* সাদা এবং কালোকে-অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বকে-ধারণ করবে। তাতে একই সময়ে 'হ্যাঁ' এবং 'না' বর্তমান। তাতে একই সময়ে সৃষ্টি এবং ধ্বংস বিদ্যমান। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 'সৃষ্টি' ও 'ধ্বংস' কথা দুটির গতানুগতিক অর্থ নেই।

এবার 'কমা' দুটির গতিবেগ কমাতে থাকুন। সাদা এবং কালো, 'হ্যাঁ' এবং 'না', 'অস্তিত্ব' এবং 'অনস্তিত্ব', 'সত্য' এবং 'মিথ্যা', 'ভালো' এবং 'মন্দ' সময়ের দ্বারা এবং সময়ের ব্যবধানে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সৃষ্টি হবে অ্যারিস্টোটলীয় সাদা-কালো যুক্তি,[২৬] যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মানব চিন্তা-গোটা বিজ্ঞান দর্শন

---

[26] 0-1 যুক্তি। তা অনুসারেঃ যা আছে তা নেই হতে পারে না; যা নেই তা একই মুহূর্তে থাকতে পারে না। এর নাম Law of Excluded Middle।

সভ্যতার ভিত। তখন আত্মবিরোধের সৃষ্টি হতে থাকবে, যা আগে ছিল না; তখন আত্মবিরোধের ফাঁদে প'ড়ে আমাদেরকে বলতে হবে যে সৃষ্টিকর্তা নেই, অথচ কমা দু'টি আলোর বেগে ঘোরার সময়ে তিনি ছিলেন।

একই কথা উল্টোভাবে বলা যায় যে কমা দুটির দ্রুত থেকে দ্রুততর করতে থাকলে উদ্ভূত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদেরকে এক পর্যায়ে 0-1 লজিকের field থেকে অন্য কোনো লজিকের field-এ চ'লে যেতে হবে।

সৃষ্টিকর্তার যুক্তি অনুসারে আত্মবিরোধের ধারণাটাই একটি আত্মবিরুদ্ধ ব্যাপার। কারণ তাঁর কাছে কোনো কিছুই আত্মবিরুদ্ধ নয়। তাঁর কাছে 'না' (অর্থাৎ 0) 'হ্যাঁ' এর (অর্থাৎ 1 এর) সাথে এক হয়ে মিশে আছে। 0 কে 1 থেকে পৃথক করেছে একটি মাত্র উপাদান- ***সময়***। সময় ব'লে যেখানে কিছু নেই, সেখানে 'হ্যাঁ' এবং 'না' ব'লে কিছু নেই। সেখানে সব কিছু একই তলে অবস্থান করছে, ঠিক এই মীবিয়াস স্টিপের মতো (গণিতবিদ মীবিয়াস এটিকে উদ্ভাবন (নাকি আবিষ্কার?) করেন):[২৭]



চিত্র-৬

এর একটি তলের ওপর দিয়ে আপনি একটি কলম দিয়ে দাগ দিতে দিতে এগিয়ে যান, দাগটি আপনা থেকেই অপর তলটিতে পৌঁছে যাবে। অথচ কোনো দ্বিতলবিশিষ্ট কাগজের (বা কোনোকিছুর) ওপর তা সম্ভব নয়। আপনি টেবিলের কাঠ ফুটো না ক'রে তার নিচের তলে পৌঁছাতে পারেন না। কিংবা তার কিনারে না গিয়ে আপনি তার নিচের তলে পৌঁছাতে পারেন না। অথচ কিনারে গেলেই যত ঝামেলা। উপরের তলের 'হ্যাঁ' তখন নিচের তলের 'না' এর সাথে মিশতে চায় না। শুরু হয় আত্মবিরোধ। 0-1 এর লড়াই। অথচ মীবিয়াস স্ট্রিপের তলে 0-1 এরূপ কোনো লড়াই করে না।

Big Bang Theory অনুসারে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সময়ে, অর্থাৎ তার সৃষ্টির মুহূর্তের কিছুটা পরে, একটি ফুলস্টপের মতো ছিল। তার থিওরি আইনিস্টাইনের আপেক্ষিতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা অনুসারে তখন space এবং time ব'লে কিছু ছিল না। *Space যদি না থাকে, তাহলে বিন্দুটি ছিল কোথায়? অর্থাৎ তার চারপাশে কী ছিল? সেকি নিজের মধ্যেই নিজে অবস্থান করেছিল? তাহলে তো মহাসেট Z এর মধ্যে Z নিজেই আছে।* তাহলে তো 0-1 লজিক আর কাজ করল না। তাহলে সেই বিন্দুটির সৃষ্টির আগে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ছিল? *তহালে কি তার*

[27] পদ্ধতি: এক ফালি কাগজ নিয়ে তাতে একটামাত্র মোচড় দিন। এবার দুই প্রান্তকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন।

অস্তিত্বের মধ্যেই তার অনস্তিত্ব ছিল, কিংবা তার অনস্তিত্বের মধ্যেই তার অস্তিত্ব লুকিয়ে ছিল? 0 -এর সাথে 1 মিশে ছিল?

0-1 লজিককে সত্য বলতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থান এবং সময় আমাদের কাছে অর্থবহ। অর্থাৎ স্বয়ং যুক্তিই বাস্তবতা নির্ভর। তা শ্বাশ্বত নয়।

তাহলে আত্মবিরোধ কাকে বলে? তা কাকে প্রমাণ করে? তার অস্তিত্ব কতক্ষণ সত্য?

আত্মবিরোধ হলো 0 এবং 1 এর মধ্যকার বিরোধ।

আত্মবিরোধ তার সত্যতাই প্রমাণ করে যার সাথে সে আত্মবিরোধে লিপ্ত হয় (A contradiction proves what it contradicts)। অর্থাৎ কোনো আত্মবিরোধকে যদি আত্মবিরোধ বলতে হয়, তাহলে বুঝা যায় যে সেক্ষেত্রে 0-1 লজিককে সত্য ধ'রে নেয়া হয়েছে। ফলে আত্মবিরোধ দ্বারা ততক্ষণই কোনো কিছুকে প্রমাণ করা যায় যতক্ষণ 0-1 লজিক সত্য থাকে, এবং যতক্ষণ যাকে প্রমাণ করা হচ্ছে তা স্থান (space) এবং কালের (time) পদার্থবিদ্যা-শাসিত গণ্ডির আওতার মধ্যে আছে। তার বাইরে স্বয়ং পদার্থবিদ্যাই অর্থহীন।[২৮]

আত্মবিরোধ হলো 0-1 লজিক থেকে উক্ত লজিকেরই বের হয়ে আসার একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু আমরা জোর ক'রে তার কুয়োর মধ্যে ধ'রে রাখি। এই প্রচেষ্টাকে *আত্মমিলনের* প্রচেষ্টা না ব'লে আত্মবিরোধ ব'লে আখ্যায়িত ক'রে 0-1 লজিকের বৈধতাকে টিকিয়ে রাখি।

0-1 লজিক যদি শ্বাশ্বত না হয়, তাহলে স্বয়ং আত্মবিরোধই শ্বাশ্বত নয়। তখন যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিরাজ করে, তাই হলে শ্বাশ্বত স্বয়ংসম্পূর্ণতা। আমরা আত্মবিরোধের মাধ্যমে তার সন্ধান পাই (ধন্যবাদ আত্মবিরোধকে), তবে তাকে পাই না।

তাকে পেলেই আমরা আবার তাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে খুঁজতাম যাকে আমরা পেতাম না।

তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ আমরা 0-1 লজিক দিয়ে তাকে খুঁজছি।

---

[28] সুতরাং আত্মবিরোধই 0-1 লজিকের শেষ সীমা। অন্য দৃষ্টিতে, *এটি একটি সমস্যা যার সমাধান 0-1 লজিকের মধ্যে নেই।* তাহলে মানব যুক্তি বিংবা তার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা complex field ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কারণ তা যে-সমস্যার (অর্থাৎ আত্মবিরোধের) জন্ম দিতে পারে, তার সমাধান দিতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত field এমন একটি অসীম Universal Field এর মধ্যে আছে যাতে আত্মবিরোধ ব'লেই কিছু নেই। গাণিতিক ভাষায়, complex field এর গোটা সেটটিকে Fc দ্বারা চিহ্নিত করলে বলতে হয় যে, তাতে যা নেই তা হলো তার complement বা Fć। ফলে উভয়ের যোগফল, বা Fc U Fć, হলো Fu বা Universal Field। এর মধ্যে শুধু 0-1 লজিকই নেই, আছে কার্য-কারণ সম্পর্ককে সময়ের পরস্পরায় উল্টে দেয়া আত্মবিরোধহীন লজিকও, যা মানব মনে বা Free Will এ দেখা যায় (পরে আলোচ্য)। *Fc এর মধ্যে অবস্থান ক'রে বিচার করলে বলা যায় যে* $Fc \cap F\acute{c} = \phi$, অর্থাৎ Fc এবং Fć এর মধ্যে *common কিছু নেই।* কিন্তু Fć এর মধ্যে অবস্থান ক'রে বিচার করতে পারলে দেখা যেত যে $Fc \cap F\acute{c} \neq \phi$, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু জিনিস common আছে- এবং তা হলোঃ $Fc \cap F\acute{c} = \mathrm{Fc}$। এ কারণে Fu তে কোনো আত্মবিরোধ নেই। পূর্ববর্তী সম্পর্কগুলি থেকে আরো অনুমান করা যায় যেঃ Fc U Fć = Fu, কারণ Fc ⊆ Fu, এবং Fć U Fu = Fu, কারণ Fć ⊆ Fu। U = '+' এবং '∩' = '×' এভাবে ধ'রে নিলেঃ

Fc + Fc' = Fu
Fc + Fu = Fu
Fc' + Fu = Fu
Fu + Fu = Fu
Fu × Fu = Fu

অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই চরম ফল পাওয়া যাচ্ছে Fu। কিন্তু Fu-Fu=? আসলে এক্ষেত্রেও Fu, 0 নয়।

তাকে একবার পেলে তখন আর মনে রাখা সম্ভব নয় যে এক সময়ে আমরা তাকে খুঁজেছিলাম। কারণ তখন আমাদের চিন্তায় 0-1 নেই-তাতে 0 এবং 1 সময় এবং স্থান দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়।

তাকে আমরা পাই না ব'লেই আনন্দিত হই। তাকে আমরা *পাইনা ব'লেই* একথা প্রমাণিত হয় যে তিনি আছেন।

তিনি complex plane এর বাইরে, অথচ complex plane -ই তার অন্তর্ভূক্ত, কারণ আর complex plane ব'লে বিচ্ছিন্ন কোনো ফাঁকিবাজ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' কোনো plane নেই।

সৃষ্টিকর্তাই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মুহূর্তে তিনি সময়ের এক-মুখী স্রোতের ওপর ভাসিয়ে দিয়েছেন গোটা সৃষ্টি-সংসার। আর তখনই-সময়ের সাথেই সৃষ্টি হয়েছে 0-1 লজিকের। এই লজিক হলো সৃষ্টির *অস্তিত্বের সঙ্গী।* ফলে তাকে দিয়ে শুধু তার *অস্তিত্বকেই বুঝা যায় এবং মাপা যায়,* তার অনস্তিত্বকে নয়। এই লজিক নিজেকে অতিক্রম করতে গেলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

কোনো কিছুকে জানা যাচ্ছে না ব'লে এ কথা বলার কোনো যুক্তি নেই যে তা নেই। মানুষের জানার ক্ষমতার ওপর বস্তুজতের বা বাস্তবতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।

সময়কে শূন্য ধ'রে নিলে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং Big Bang Theory অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই অর্থহীনতা 0-1 লজিকের বিচারে অর্থহীনতা। কারণ সেই ফর্মূলার ভিত্তিভূমি হলো এই লজিক।

সময়কে অতিক্রম করতে হলে মানুষকে সৃষ্টি-জগতের বাইরে যেতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ সৃষ্টিজগতের বাইরে যা কিছু আছে তাও সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভূক্ত। তার শুরু এবং শেষ আছে কেবল 0-1 লজিকের দৃষ্টিতে-অথচ এই লজিকই তার বিশলতা মেপে শেষ করতে পারে না। বিজ্ঞান জানে (অর্থাৎ 'বিশ্বাস' করে) যে বিশ্বজগৎ সসীম, অথচ সে তার সীমার শেষে পৌঁছাতে পারে না! কারণ তার এই জ্ঞানের উৎস হলো 0-1 লজিক, অথচ বিশ্বজগতের 'সীমার উৎস' সেই লজিক নয়।

0-1 লজিক জানে যে বিশ্বজগতের সীমা আছে, অথচ সে তা মাপতে বা সেখানে পৌঁছাতে পারে না। একইভাবে, এই বইতেও 0-1 লজিক দ্বারা প্রমাণ করা হলো যে সৃষ্টিকর্তা আছেন, যদিও সেই লজিক দ্বারা তা প্রমাণ করা সম্ভব নয় তিনি কেমন আছেন বা কোথায় আছেন।

তাঁর লজিক অনুসারে তিনি আদি-অন্ত কাল ধ'রেই *আছেন*; তাঁর কাছে *ছিলেন এবং থাকবেন ব'লে কিছু নেই।* তার ব্যকরণে *ক্রিয়া* আছে, তবে *ক্রিয়ার কাল* (Tense) নেই। তিনি কালেও অতীত।

আমাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিজগত হলো আমাদের complex plane , কারণ তা দিয়েই আমরা তাকে মাপি। সেখানে '+', '-', '×', '÷' হলো বস্তু ও শক্তির বিভিন্ন ধরনের রূপন্তর বা transformation। ফলে ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছু এরূপ রূপান্তরের পরও ব্রহ্মণ্ডের মধ্যেই রয়ে যায়। কুয়োর মাপের লাফ কুয়োর ব্যঙকে কুয়োর মধ্যেই

ধ'রে রাখে। তার কাজের যুক্তি হলো 0-1 লজিক। সুতরাং এই লজিক দিয়ে এই plane এর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন করার অধিকার জ্ঞানীর মৌলিক অধিকার, ফলে তার যুক্তির সাপেক্ষে আত্মবিরোধী প্রশ্ন করার অধিকারও তার মৌলিক অধিকার। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তিনি যখন প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান (অন্তত এই অর্থে), তখন পুরনো প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার যদি তিনি করেন তাঁকে আত্মবিরোধের যন্ত্রণা পেতে হবে।

হয়তো কেউ বলবেন, যদি এমনই হয় যে সৃষ্টিজগত অনন্তকাল ধ'রে আছে, তাহলে তা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হিসেবে-তাকে কেউ সৃষ্টি করেছেন এমন ভাবার দরকার নেই।

জবাবে আমি বলব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নামক বস্তুজগতই যদি অনন্তকাল ধ'রে থাকতে পারে,তাহলে সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং কেন পারবেন না? 0-1 লজিককে অস্বীকার ক'রেই যখন বলছেন যে , যা অনন্তকাল যাবত আছে তা হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (universe), তাহলে সেক্ষেত্রে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' শব্দটির স্থলে 'সৃষ্টিকর্তা' শব্দটিকে বসাতে আপনার আপত্তি কেন। আত্মবিরোধকেই যখন মেনে নিচ্ছেন, তখন যা-খুশি তো মেনে নেয়া যায়। যুক্তির ওপারে তো সবই এক হয়ে মিশে গেছে। সেখানে সময় এবং স্থান তো দুই ব'লে কিছুর অস্তিত্বের জন্ম দেয়নি। অধিকিন্তু, বস্তুজগতের সব প্রশ্নের উত্তর আমরা বস্তুজগৎ থেকেই পাচ্ছি। কিন্তু মনের সব প্রশ্নের উত্তর তাতে পাচ্ছি না। এর উত্তর যে field -এ আছে তা একটি ইচ্ছার field। তার মধ্যে রয়েছে real field. প্রশ্ন থাকলে উত্তর থাকতেই হবে, আমরা তা জানি বা না জানি। নইলে গোটা সিস্টেমটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। Mind এবং Matter উভয়ই সেই সিস্টেমের অন্তর্ভূক্ত।

সন্দেহপ্রবণ যুক্তিবিদ আবারও চূড়ান্তভাবে বলবেন, "এ সব আপনার কল্পনা, মনের সৃষ্টি।"

এই গালমন্দ শুনতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি শুধু একটি পাল্টা অনুরোধ করব: একেবারেই সত্য কথা যে এসব মনের সৃষ্টি; কিন্তু লক্ষ্য ক'রেছেন মনের কত বড় সীমাবদ্ধতা? যুক্তি দিয়েও তো আমরা এতক্ষণ একজন *যুক্তিসিদ্ধ* সৃষ্টিকর্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারলাম না! আত্মবিরোধ রয়েই গেল। *মানুষের যুক্তির সবচেয়ে বড় এবং হতাশাব্যঞ্জক সীমাবদ্ধতা এই যে তা কোনো যুক্তিসিদ্ধ সর্বশক্তিমানকে উদ্ভাবন করতে পারে না।* যুক্তি দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করতে গেলে তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বলে আবার নিজেকে ধ্বংস ক'রে বসবেন। হায় যুক্তি! যুক্তির এই সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে যে সে-যুক্তি অন্য কারো সৃষ্টি।

আসলে মানুষ সময় এবং স্থানের ফর্মূলায় চিন্তা করে। তার চিন্তাই হলো সময় এবং স্থানের একটি সমন্বয়। এখানে চিন্তা বলতে আমি যুক্তিকে বুঝাচ্ছি। মুক্তচিন্তা বা Free Will ব'লে যা আছে, তা যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারে, তবে যুক্তির অতীতে কী আছে তা জানতে পারে না, কারণ তা নিজে কোনো যৌক্তিক কাঠামোর ওপর গঠিত নয়। যুক্তিকে শুরু করিয়ে দেয় এই Free Will, তবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। যুক্তি চলে নিজেরই গতিতেই।

সৃষ্টির কাঠামো

ধন্যবাদ যুক্তিকে। ধন্যবাদ সময়কে। তাদের কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির অস্তিত্ব, মানব জীবন। শুধু তাই নয়, *মানব জীবন সেই কাঠামোরই সৃষ্টি।* কুয়োর ব্যাঙ কুয়োরই সৃষ্টি। মানুষ তার গণ্ডি অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়। সে যদি বিশুদ্ধভাবে চিন্তা করতে পারত তাহলে দেখত যে সময়ের গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চাওয়াই আত্মবিরোধ। গণ্ডিই তাকে সৃষ্টি করেছে। অনন্ত জীবন লাভ ক'রে গণ্ডির বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা মানে নিজের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করার অসম্ভব বাসনা।

ধন্যবাদ সময়কে, এই গণ্ডিকে। সময় আছে ব'লেই বিশ্বজগতে কার্যকারণ নিয়মের পারস্পর্য বলবৎ আছে। সময় আছে বলেই আগে মেঘ হয়, পরে বৃষ্টি হয়। সময়কে অতিক্রম করা সম্ভব হলে আগে বৃষ্টি হতো, পরে ঐ বৃষ্টি-প্রদানকারী মেঘ হতো। আরো উদ্ভট হতো যখন আমরা আগে বৃষ্টিতে ভিজতাম, এবং তার পরই 'সত্যিকারের' বৃষ্টি হতো। সময় আছে বলেই আমরা আয়নার সামনে আগে দাঁড়াই তারপর আমাদের ছবি আয়নাতে ভাসে (সময়ের পার্থক্য যত কমই হোক না কেন)। কিন্তু সময় না থাকলে, কিংবা তার স্রোত উল্টো দিকে যাওয়া সম্ভব হলে, আগে আয়নায় আমাদের ছবি ভাসত, তারপর আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াতাম। সময়ের উল্টো দিকে যাওয়া সম্ভব হলে আমরা আগে মরতাম, তারপর জন্মাতাম। আমাদের জীবন শুরু হতো মৃত্যু থেকে, শেষ হতো জন্মের মধ্যে। ধ্বংস থেকে উঠে আসত সৃষ্টি। অনস্তিত্ব থেকে উঠে আসত অস্তিত্ব। আগে সাজা পেতাম, তারপর অপরাধ করতাম।

এই সময় যাঁর হাতের খেলার পুতুল,তিনি কি তাহলে অপরাধীকে আগে সাজা দিতে পারেন না? তিনি কি সবার ভাগ্য আগে থেকে নির্ধারিত ক'রে রাখতে পারে না? তিনি কি তাহলে ধ্বংস থেকে আবার সৃষ্টি করতে পারেন না? মৃত্যুর পর মানুষকে আবারও জীবিত ক'রে তুলতে পারেন না?

অবশ্যই পারেন কারণ তিনি সময়ের অতীত।

সময় তাঁরই সৃষ্টি। সময় তাঁর ইচ্ছে অনুসারে তার গতি বদলাতে পারে। এখন যদি ধ'রে নেয়া হয় যে সময় কোনো নির্দিষ্ট দিকে বইবে না-না সামনে, না পেছনে-অর্থাৎ তাতে কোনো প্রবাহই থাকবে না, তাহলে কি সব অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে?

না, তখন সবই *চিরস্থায়ী* হয়ে যাবে।

তখন সব ব'লেও কিছু থাকবে না, থাকবে শুধু এক।

তখন আমি এখানে ব'সে যখন লিখছি, তখনই আমেরিকায়, রাশিয়ায়, ফ্রান্সে, ব্রিটেনে-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিন্দুতে ব'সে লিখছি। তখন আমি সবখানে-কারণ তখন আমি আর আমি নেই।

চিন্তার বাইরে। তবুও কল্পনার বাইরে নয়। অর্থাৎ, চিন্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং কল্পনাই তার চেয়ে বেশি প্রশস্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই কল্পনাই Free Will, আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সত্তা। এর বেশি কিছু আমাদের জানা সম্ভব নয়। কারণ এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে পেরে আমরা আর আনন্দিত থাকব না।

আপনাকে যদি এই মুহূর্তে বিশাল তালিকে বানিয়ে দেয়া হয় আপনি এখন থেকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কী কী করবেন, আপনার জীবনে কী কী ঘটবে, তাহলে, সব ঘটনা অত্যন্ত সুখকর হলেও, তা আপনার আর ভালো লাগবে না। আপনি সব কিছু জেনে শুনে আর বেঁচে থাকতে চাইবেন না, যদি আপনি জ্ঞানী হন। কারণ তখন আপনার জীবনে তাই ঘটবে যা আপনি আগে থেকে জানেন। তখন আপনি আপনার জ্ঞানের কৃতদাস। তখন যা জানেন তাই ঘটবে, অথচ তাকে অতিক্রম করার কোনো উপায় নেই। তখন Free Will ব'লে আপনার কিছু নেই। মানুষকে এই কষ্ট থেকে রেহাই দেয়ার জন্য তাকে Free Will নামক প্রতারককে দেয়া হয়েছে। মানুষের জ্ঞান যদি তার সাথে প্রতারণা না করত, তাহলে সে আর জ্ঞানী হতে চাইত না। তখন জ্ঞানই হতো মৃত্যুর নামান্তর।

কিন্তু এটাই সম্ভবত পরম সত্য যে মানুষের প্রতি-মুহূর্তের ভবিষ্যত আগে থেকেই নির্ধারিত। সময় যদি এলোপাথাড়িভাবে (randomly) বইত, তাহলে হয়তো একথা বলার পেছনে কোনো যুক্তি থাকত না। কিন্তু সময়ের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে *কেবল একটি ঘটনা ঘটাই সম্ভব।* ফলে তার বিস্তৃত তলের প্রতিটি বিন্দুতেই পুরোপুরি *নির্দিষ্ট* কিছু ঘটনাই ঘটা সম্ভব। সব কিছুর সম্ভাবনা আগে থেকেই নির্ধারিত, এবং তা ঘটবেও।

আপনি হয়তো বলবেন, "তাহলে আমি এখন আপনার বইটি ছিড়ে ফেলতাম, এও কি নির্ধারিত ছিল?"

আমি বলব, হ্যাঁ।

"যদি না ছিড়তাম তাহলে যা ঘটত তাও নির্ধারিত ছিল?"

আমি বলব, হ্যাঁ। নির্ধারিত ছিল যে আপনি ছিড়বেন, তারপর আবার না-ছেড়ার ধুয়ো তুলবেন না। কিন্তু করতে হবে আপনাকে একটাই। আপনি তো একই সাথে 0 এবং 1 কে মেনে নিতে পারেন না। আপনি তো 0-1 এর সাদা-কালো binary লজিকের ফাঁদে আটকা প'ড়ে আছেন। আপনি আপনার সময়ের complex plane এর বাইরে কিছুই করতে পারেন না। আপনি সময় থেকে যে-কোনো উপাদান নিয়ে যতভাবেই ভোজবাজি খেলে তাকে পাল্টান না কেন, ফলাফলও উক্ত সময়ের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

"কিন্তু আমি এখন তো বইটি পড়তেও পারি আবার না-ও পড়তে পারি। সব তো আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।"

ঠিক। কিন্তু এক বার পড়ার পর আপনি পেছন দিকে তাকিয়ে দেখবেন যে তা আপনি প'ড়ে ফেলেছেন। ফলে তখন আপনার দ্বারা বলা সম্ভব নয় যে আপনি তা পড়েননি। ঘটে-যাওয়া ঘটনার কোনো বিকল্প নেই। কাজের আগে আমরা অনেক কিছুই ভাবতে পারি। কিন্তু কাজটি করার পর একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তা না করার যোগ্যতা আমাদের ছিল না। অন্য কোনো উপায় ছিল না ব'লেই আমাদেরকে তা করতে হয়েছিল। কাজের পরে যে-জ্ঞান আমরা অর্জন করি তাই-ই প্রকৃত জ্ঞান। আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলি অতীত থেকে বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে, অথচ ভাগ্য আমাদেরকে মেপে দ্যাখে ভবিষ্যত থেকে বর্তমান হয়ে অতীতের দিকে।

আপনি বলবেন, "সবই যদি পূর্বনির্ধারিত, তাহলে আর মন্দকে ভালো হতে ব'লে, চোরকে চুরি করার দায়ে শাস্তি দিয়ে ...... কী লাভ?"

আমার জবাব, আমি জানি না। আপনার প্রশ্নের ভিত্তি হলো সেই 0-1 লজিক। ঐ লজিক দিয়ে তা জানা সম্ভব নয়।

এমনও তো হতে পারে যে আমাদের ভাগ্য আগে থেকে আমাদের ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। যা যা ঘটবে তা তিনি আগে থেকে জানেন ব'লেই তিনি তা 'লিখে রেখেছেন'। তাছাড়া আমরা যে complex field-এ বেঁচে আছি তার কোন 'সংখ্যার' সাথে কোনে 'সংখ্যার' কী সমন্বয় (অর্থাৎ +, -, ×, ÷) ঘটালে ফল কী হবে তা তো আমরাই আগে থেকে ব'লে দিতে পারি। নয় কি?

সুতরাং, আমি বলব, আসুন আমরা সেই 0-1 লজিকে ফিরে যাই। সুস্থ জীবন-যাপন করি। একে অপরকে ভালোবাসি। সুন্দর বিশ্ব-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলি। *যা আমরা জানি তার মধ্যে আমাদের সত্যতাকে সীমাবদ্ধ রাখি। যা জানি না তার দোহাই দিয়ে ধাঁধাঁর সৃষ্টি ক'রে অহেতুক ধর্মবিরোধ, আত্মবিরোধ, ধর্মে-ধর্মে খুনোখুনি এসব থেকে বিরত থাকি।*

কূপমন্ডুক ধার্মিকদের বলি, আপনার ধর্মকে ধ্বংস করবেন না। সে অধিকার আপনাদের নেই। তার চেয়ে নাস্তিকতা ভালো। কারণ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করলে তাঁর কিছু এসে যায় না, ক্ষতি হয় আমাদেরই, যদি আমরা তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন না ক'রে চলি। ধর্মকে না বুঝে গায়ে প'ড়ে ধর্মের পক্ষ নিয়ে 'ধর্মযুদ্ধে' লিপ্ত হওয়া হলো খাঁটি অর্থে অধর্ম করা।

"কিন্তু কূপমণ্ডুক ধার্মিকতা বলতে কী বুঝায়?"

শক্ত প্রশ্ন। কারণ এখানে মনস্তত্ত্ব এব 0-1 এর যুক্তির কারসাজি আছে।

"ধর্মের দায়িত্ব কি পুরোপুরি 'ধার্মিকের' হাতে তুলে দেয়া উচিত?"

শক্ত প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর না জানলে এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

"কে ধার্মিক?"

যে ধর্ম মানে।

"কোন ধর্ম সত্য?"

আলোচনা এবং বিশ্লেষণের বিষয়।

"প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার নিকট থেকে কি প্রচলিত কোনো ধর্মের একটিও এসেছে? আল্লাহ-ই কি সেই সৃষ্টিকর্তা?"

আসলে এই বিষয়টিকে এই বইয়ের আওতাভুক্ত নয়। পরবর্তী কোনো বইতে তার জবাব দিব।

"বিজ্ঞান যে অনেক সময়ে বলে সৃষ্টিকর্তা ব'লে কিছু নেই। এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন?"

বিজ্ঞান একেক সময়ে একেক কথা বলে।

"তাহলে বিজ্ঞান মিথ্যা?"

না। বিজ্ঞান সত্যের পথে আছে বলেই তা একেক সময়ে একে কথা বলেছে। সে যা মাপতে পারে না তাকে স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের এই বস্তুবাদী সততাই তাকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে কেবল তাই বিশ্বাস করে যা সে জানে। জ্ঞানের বাইরে তার বিশ্বাস দৌড়ায় না। সে যদি সবকিছুই আগে থেকে বিশ্বাস ক'রে ব'সে থাকত, তাহলে সে আর এগুতো না। ফলে আমরাও এই নোতুন পৃথিবীটাকে পেতাম না। এই বইতে আমরা Time এবং Space এর যে ধারণা ব্যবহার করেছি তাও বিজ্ঞানের অবদান। তবে সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানী এক নয়- এই কথাটা মনে রাখতে হবে। বিজ্ঞান হোক *বস্তুকেন্দ্রিক*, তবে তা যেন *বস্তুনির্ভর না হয়।*

"ডারউইনের....."

ডারউইনের সৃষ্টির উৎসকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি, ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কেবল সৃষ্টির এক অংশের *বিবর্তনকে*। বিবর্তন তো সময়েরই একটি আবশ্যিক ফলশ্রুতি। তবে ডারউইনের কথা অনুসারে বিবর্তনের সংজ্ঞাকে নির্ধারিত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ডারউইন একটি সত্যকে জোর ক'রে চরমে নিয়ে গেছেন। কোনো সত্যই চরমে গিয়ে সত্য থাকে না। তখন তা হয় 0 না-হয় 1 হতে চায়। মাঝামাঝি থাকতে চায় না। তবে তাঁর চিন্তায় সত্যিকারের বিপ্লবের উপাদান আছে। এবং তা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সাথে আত্মবিরোধী নয়- ডারউইন নিজে যা-ই বলুন না কেন। তিনি নিজের পুরোপুরি ডারউইনবাদী ছিলেন কি না সন্দেহ আছে।

"কিন্তু মোটের ওপর মাথাটা ঘুরে আসে।"

কিছুক্ষণ ঘুরতে দিন। পর্যাপ্তভাবে বিস্মিত না হতে পারলে কোনো কিছু বিশ্বাস ক'রে খাঁটি আনন্দ পাওয়া যায় না।

আমাদের নিজেদের একটি শুরু এবং শেষ আছে। ফলে আমাদের চিন্তাকেও কোথাও না কোথাও গিয়ে থেমে যাওয়া উচিত।

জ্ঞান যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই শুরু হয় সত্যিকারের বিশ্বাস। তখন বিশ্বাস করার অধিকার জ্ঞানীর *মৌলিক* অধিকার।

বিশ্বাস হলো এমন যুক্তি যা জ্ঞানের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠা পায়, অথচ তার পর আর তার অস্তিত্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল থাকে না।

জ্ঞান জানে সে কী জানে, কিন্তু জানে না কী সে জানে না; বিশ্বাস জানে না সে কী জানে, কিন্তু জানে কী সে জানে না। আমরা কী জানি না তা যখন ভুলে যাই তখন আমরা যা জানি তা আমাদেরকে ধ্বংস করে। বিশ্বাস আমাদেরকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

“আমাকে কী বিশ্বাস করতে হবে?”

বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা যেটুকু তার ওপর নির্ভর ক'রে দাম্ভিক হয়ে নিজেদের ধ্বংসের পথ বেছে নেয়া উচিত নয়। বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা সবাই একই বৃন্তে ফুটে থাকা এক গুচ্ছ ফুল।বিশ্বাস করতে হবে যে সেই গুচ্ছের এক অংশকে ছিড়ে রকমারি মালা গেঁথেও অন্য কোনো অংশ পরিপূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না। বিশ্বাস করতে হবে যে মৃত্যুই শেষ কথা নয়-আমরা যা-কিছু করছি তার পরিণামও একই সাথে তৈরি হচ্ছে, সেই কাজ এবং পরিণাম-প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান শুধু সময়ের।

“কিন্তু আপনার বইটি পড়ার পরেও তো আমি ঘুষ খাব, মিথ্যাচার করব, ফাঁকি দেব, খুনের হুকুম দেব, ধর্ষণ করব, স্বামীকে উত্যক্ত করব, ননদকে হিংসা করব, বউমাকে মেনে নিতে পারব না, প্রচুর যৌতুক চাব, দশের সম্পদ মেরে খাব ....”

আহ্, প্লিজ, এখন চুপ করুন! এবার মাথাটা আমারও ঘুরছে।